Government of West Bengal
Office of the Principal

e-mail : tehattagovtcollege@gmail.com
Web : tehattagovtcollege.ac.in
Ph. : 03471-250100

GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE, TEHATTA
Tehatta, Nadia, Pin-741160

# DEPARTMENT OF HISTORY
# PROJECT WORK
# INTERNAL ASSESMENT

## ACADAMIC SESSION: 2022-23

1. 1ST SEMESTER CC-1
2. 1ST SEMESTER CC-2
3. 3RD SEMESTER SEC
4. 6TH SEMESTER CC-14
5. 6TH SEMESTER DSE-2 HONOURS
6. 6TH SEMESTER DSE-2 GENERAL

## ACADAMIC SESSION: 2021-22

1. 5TH SEMESTER DSC-2

Govt. Gen. Degree College Tehatta
Estd-2014
Govt. of West Bengal

Dr. Sibsankar Pal
Officer-in-charge
Govt. Gen. Degree College, Tehatta
Nadia-741160

# TOPIC : ষোড়শ মহাজনপদ

## HISTORY — (H)

নাম : পার্থ শর্মা
SEM : 1st
ROLL : 12
COLLEGE : GOVERNMENT GENERAL DEGRE COLLEGE, TEHATTA

## PAPER-CC1

• **ষোড়শ মহাজনপদের যুগ** : খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতে কোনও কেন্দ্রীয় রাজশক্তি ছিলনা, এমনকি এই যুগে ভারতে কোনও অঞ্চলে সার্বভৌম রাজ্যও গড়ে ওঠেনি। বিভিন্ন বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, এই সময় উত্তর ভারত ষোলোটি বৃহৎ রাজ্যে বিভক্ত এবং এদেরকে একত্রে বলা হত ষোড়শ মহাজনপদ। এই ষোলোটি রাজ্য হল —

(1) কাশী (2) কোশল (3) অঙ্গ (4) মগধ
(5) বৃজি (6) মল্ল (7) চেদি (8) বৎস
(9) কুরু (10) পাঞ্চাল (11) মৎস্য (12) শূরসেন
(13) অস্মক (14) অবন্তী (15) গান্ধার - (16) কম্বোজ ।।

• ষোলোটি মহাজনপদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল —

(1) **কাশী** : ষোড়শ মহাজনপদের প্রথমদিকে কাশী ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ রাজ্য। এর রাজধানী বারাণসী। গৌতম বুদ্ধের সময় কাশী রাজ্যের পতন ঘটে এবং কোশল তা জয় করে।

(2) **কোশল** : বর্তমান উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল নিয়ে গঠিত কোশল ছিল একটি বৃহৎ রাজ্য। এর রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী। মহাভারত খ্যাত বিখ্যাত ইক্ষ্বাকু বংশের মহাকোশল এখানে রাজত্ব করতেন। তিনি তার কন্যা কোশলদেবীর সঙ্গে মগধ রাজ বিম্বিসারের বিবাহ দেন।

(3) **অঙ্গ** : বর্তমান বিহারের ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলা নিয়ে অঙ্গ রাজ্য গঠিত। গঙ্গা ও চম্পা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত চম্পা ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। উত্তর ভারতে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অঙ্গ রাজ্যের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল মগধ।

(4) **মগধ** : বর্তমান বিহারের গয়া ও পাটনা জেলা নিয়ে মগধ রাজ্য গঠিত ছিল। গঙ্গা, শোন ও চম্পা নদী পরিবেষ্টিত মগধ রাজ্যের প্রথম রাজধানী ছিল গিরিব্রজ। মগধে হর্যঙ্ক বংশ, শিশুনাগ বংশ, নন্দবংশ রাজত্ব করেছেন। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বুদ্ধদেবের সময় হর্যঙ্ক বংশীয় রাজা বিম্বিসার মগধের সিংহাসনে বসেন।

(5) **বৃজি** : গঙ্গা নদীর উত্তর দিক থেকে নেপাল পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চল নিয়ে বৃজি প্রজাতন্ত্র গঠিত ছিল। বৈশালী ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। বৈশালী ছিল সমকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগর। বিভিন্ন বৌদ্ধগ্রন্থে বৈশালীর সমৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে।




(6) **মল্ল** : বৃজি রাজ্যের উত্তরে সম্ভবত উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায় মল্ল রাজ্য অবস্থিত ছিল। বৃজি রাজ্যের মতো এটিও ছিল একটি প্রজাতান্ত্রিক রাজ্য। এই রাজ্যটি দুটি অংশে বিভক্ত ছিল এবং তাদের রাজধানী ছিল কুশীনগর ও পাবা।

(7) **চেদি** : চেদি হল মহাভারতে বর্ণিত একটি অতি প্রাচীন রাজ্য। যমুনা নদীর কাছে বর্তমান বুন্দেলখণ্ড ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিয়ে এই রাজ্যটি গঠিত ছিল। এর রাজধানী ছিল শুক্তিমতী। কাশী রাজ্যের সঙ্গে চেদির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

(8) **বৎস** : বর্তমান উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদের কাছে যমুনার দক্ষিণ তীরে বৎস রাজ্যটি অবস্থিত। এর রাজধানী ছিল প্রাচীন কৌশাম্বী। এই রাজ্যটি কৃষিতে খুব উন্নত ছিল। বৎসরাজ উদয়ন প্রাচীন ভারতের এক কিংবদন্তি ব্যক্তি ছিলেন।

(9) **কুরু** : দিল্লি ও তার সন্নিহিত অঞ্চল নিয়ে কুরু রাজ্য গঠিত ছিল। কুরু রাজ্যের রাজধানী ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ। হস্তিনাপুর ছিল এই রাজ্যের অন্যতম নগরী। এই রাজ্যটি ছিল ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র।

(10) **পাঞ্চাল** : কুরু রাজ্যের প্রতিবেশী পাঞ্চাল রাজ্যটিও মহাভারতের যুগে বিখ্যাত ছিল। বর্তমান রোহিলখণ্ড ও উত্তরপ্রদেশের গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের কিছু অংশ নিয়ে এই রাজ্যটি গঠিত ছিল। রামায়ণ, মহাভারত, দিব্যাবদান থেকে জানা যায়, যে, গঙ্গা নদী এই রাজ্যটিকে উত্তর পাঞ্চাল ও দক্ষিণ পাঞ্চাল দুটি অংশে বিভক্ত করেছে। উত্তর পাঞ্চালের রাজধানী ছিল অহিচ্ছত্র এবং দক্ষিণের কাম্পিল্য।

(11) **মৎস্য** : বর্তমান রাজস্থানের জয়পুর, ভরতপুর ও আলোয়ার নিয়ে মৎস্য রাজ্য গঠিত ছিল। মহাভারতের প্রতিবেশী রাজা বিরাট এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এই রাজ্যের রাজধানী বিরাটনগর।

(12) **শূরসেন** : পাঞ্চালের পাশে যমুনা নদীর তীরে শূরসেন রাজ্য অবস্থিত ছিল। এর রাজধানী ছিল মথুরা। মহাভারত ও পুরাণ অনুসারে যদু বা যাদব বংশীয় রাজারা এখানে রাজত্ব করতেন।

(13) **অস্মক** : দক্ষিণ ভারতের গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত অস্মক রাজ্যের রাজধানী ছিল পোটালি, পোটান বা পোদান। মহাভারতের বর্ণনা অনুযায়ী অস্মক নামে এক রাজর্ষি পোদান নগরীর পত্তন করেন।

(14) **অবন্তি** : মালব ও মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশ নিয়ে অবন্তি রাজ্য গঠিত ছিল। সম্ভবত বেত্রবতী নদী এই রাজ্যকে উত্তর ও দক্ষিণাংশের রাজধানী ছিল মাহিষ্মতী। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে গৌতম বুদ্ধের সময় এর অধিপতি ছিলেন প্রদ্যোত। তাকে 'চণ্ড' প্রদ্যোত বলা হত।

(15) **গান্ধার** : তক্ষশীলা ও কাশ্মীর উপত্যকা নিয়ে শক্তিশালী গান্ধার রাজ্য গঠিত। এর রাজধানী তক্ষশীলা ছিল প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র 'ও' বাণিজ্য স্থল।

(16) **কম্বোজ** : উত্তর-পশ্চিম ভারতে গান্ধার রাজ্যের কাছেই ছিল কম্বোজ রাজ্য। এর রাজধানী ছিল রাজপুর। মহাভারতে এর উল্লেখ আছে। আর্যরা ভারতে প্রবেশের সময় এখানে বসবাস করে।

HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT. GEN. DEG COLLEGE, TEHATTA

HISTORY HONOURS
NAME - SNEHA HALDER
REGN NO - 036566
ROLL NO - 3111157 - 2240181
PAPER - CC 1

## পরবর্তী বৈদিক যুগে ধর্মীয় ভাবনার পরিবর্তন :

ধর্মীয় ক্ষেত্রে বেশকিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ঋকবেদের যুগে যুদ্ধের দেবতা ইন্দ্রের জনপ্রিয়তা ছিল সর্বাধিক। কিন্তু পরবর্তীযুগে ইন্দ্রের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। উষা, অর্যমা, মার্তণ্ড, দক্ষ ও পার্জন্যের মতো দেবতারা অদৃশ্য হয়ে যায়। এই সময় কিছু নতুন দেব-দেবীর আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা, জয়ন্ত, কুবের, নারায়ণ, উমা প্রভৃতি।

নারায়ণ

ঋকবৈদিক যুগে রুদ্র ও বিষ্ণু ছিলেন গৌণ দেবতা, কিন্তু পরবর্তী বৈদিক যুগে তাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। বিষ্ণু ছিলেন পালনকর্তা। পরবর্তী বৈদিকযুগে অনার্যদের সঙ্গে সহাবস্থানের ফলে কিছু ধর্মীয় ধ্যান ধারণার উদ্ভব ঘটে। অনার্যদের কাছ থেকে আর্যরা যাদু, ডাকিনী বিদ্যা প্রভৃতি গ্রহণ করেন। এছাড়া অনার্যদের মত আর্যরা সাপ, গাছ পাথর ও অপ্সরাদের উপাসনা শুরু করে।

প্রজাপতি ব্রহ্মা

পরবর্তী বৈদিক যুগে পুরোহিতদের মর্যাদা বেড়ে যায়। এই সময় ৬টি নতুন শ্রেণীর পুরোহিত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। ফলে পুরোহিত শ্রেণীর সংখ্যা বেড়ে যায়। ৬টি হয় এবং এই যুগে একেশ্বরবাদী তত্ত্ব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় এবং তিনি বহু দেবতার ভেতর দিয়ে ঈশ্বর বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছে। এই যুগে জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলের বিকাশ ঘটে। আরণ্যক ও উপনিষদে একথা ব্যক্ত হয়েছে। মানুষ তার কৃতকর্ম অনুযায়ী ফলভোগ করে, তাই মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য গড়ে তুলে।

পরবর্তী বৈদিকযুগে জড়বাদ প্রচলিত হয়েছে. ঋষি উদ্দালক জড়বাদের কথা প্রচার করেছে। এরা বিশ্বাসী যে, দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সবকিছু শেষ হয়ে যায়। সুতরাং এই জীবনে যতখানি সম্ভব সুখ ভোগ করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। আর্যদের সময় গণনার পদ্ধতি ছিল নিখুঁত।

আলোচ্য থেকে আমরা ঋকবৈদিক এবং পরবর্তী বৈদিক যুগের মধ্যে তুলনা করে আমরা বলতে পারি যে, ধর্মীয় জীবন এবং আচার-আচরণের ক্ষেত্রে কিছুটা তারতম্য ঘটলেও ধর্মের মূলসুরের কোনো পার্থক্য ঘটেনি। "ঈশ্বর এক ও অভিন্ন, বহুদেবতার মধ্যে দিয়ে একের প্রকাশ" — এই ধারণা উভয় যুগেই প্রচলিত ছিল।

HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT GEN DEG COLLEGE, TEHATTA

## প্রতিকৃতাবলী

[illegible] -



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

| | |
|---|---|
| [illegible] | ২৬ জুন ১৮৩৮ [illegible] [illegible] কলকাতা, [illegible] প্রেসিডেন্সি, ব্রিটিশ ভারত |
| মৃত্যু | ৮ এপ্রিল ১৮৯৪ (বয়স ৫৫) কলকাতা, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ব্রিটিশ ভারত |
| পেশা | সরকারি কর্মকর্তা, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| দাম্পত্যসঙ্গী | রাজলক্ষ্মী দেবী |

পরিচয় : [illegible] Bankim Chandra Chattopadhyay [illegible] [illegible]

[illegible] : [illegible] (১৮৬৫) [illegible]

গ্রন্থ : ১. [illegible] - ১৮৮২ [illegible]

[illegible] - ১৮৬৬ [illegible]

[illegible] - ১৮৮২ [illegible]

[illegible] - ১৮৮২



রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

| | |
|---|---|
| জন্ম | ১২ এপ্রিল ১৮৮৫ বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ব্রিটিশ ভারত (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, ভারত) |
| মৃত্যু | ২৩ মে ১৯৩০ (বয়স ৪৫) [illegible], কলকাতা, ব্রিটিশ ভারত (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, ভারত) |
| জাতীয়তা | ভারতীয় |
| পেশা | প্রত্নতাত্ত্বিক |
| দাম্পত্যসঙ্গী | কাঞ্চনমালা দেবী |

পরিচয় : [illegible]

শিক্ষা : [illegible]

কর্মজীবন : [illegible]

গ্রন্থ :

1. The Origin of the Bengali Script — ১৯১৯
2. The Age of the Imperial Guptas.
3. Prehistoric, Ancient and Hindu India



হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

| | |
|---|---|
| জন্ম | [illegible] ১৮৫৩ [illegible], ব্রিটিশ ভারত |
| মৃত্যু | ১৭ নভেম্বর ১৯৩১ কলকাতা, [illegible], ব্রিটিশ ভারত |
| পেশা | [illegible] |
| বাসস্থান | কলকাতা |
| জাতীয়তা | ভারতীয় |
| শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান | সংস্কৃত [illegible] |
| উল্লেখযোগ্য রচনাবলি | [illegible] |
| উল্লেখযোগ্য পুরস্কার | ১৯১১ [illegible] |

পরিচয় : [illegible]

[illegible] : [illegible]

গ্রন্থ : [illegible]

১. [illegible] ১৯১১

২. [illegible] - ১৯২৩

[illegible]

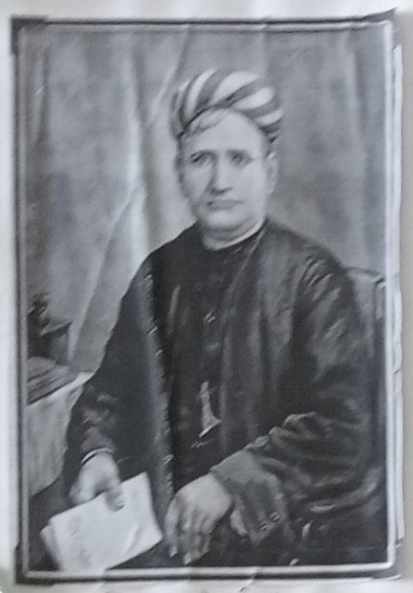

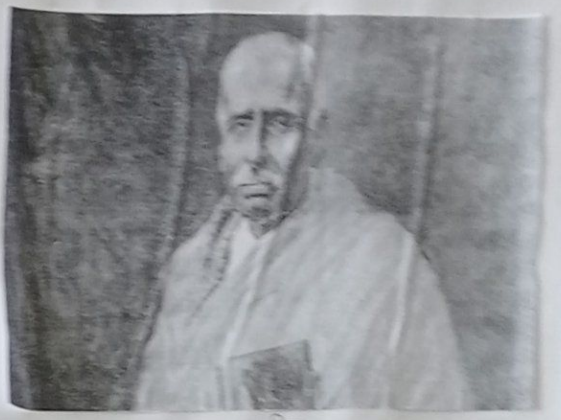

# সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক নগর ও নদী

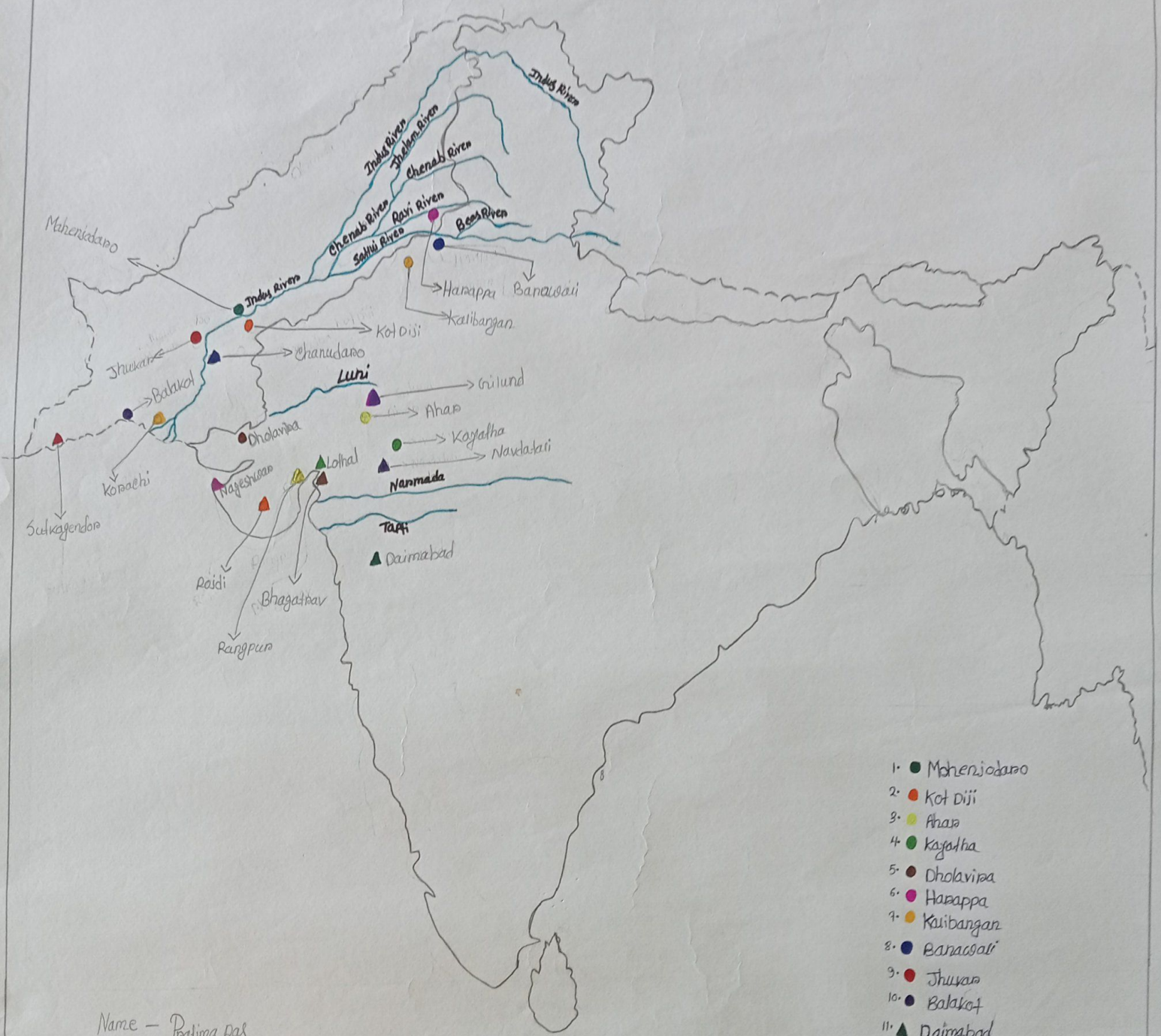




1. ● Mohenjodaro
2. ● Kot Diji
3. ● Ahar
4. ● Kayatha
5. ● Dholavira
6. ● Harappa
7. ● Kalibangan
8. ● Banawali
9. ● Jhukar
10. ● Balakot
11. ▲ Daimabad
12. ▲ Rojdi
13. ▲ Rangpur
14. ▲ Lothal
15. ▲ Bhagatrav
16. ▲ Nageshwar
17. ▲ Karachi
18. ▲ Chanudaro
19. ▲ Sutkagendor
20. ▲ Navdatoli
21. ▲ Gilund

Name – Pratima Das
Roll – 1
Sem – 1st
Sub – History Honours
Registration Number – 036557

HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT. GEN. DEG. COLLEGE

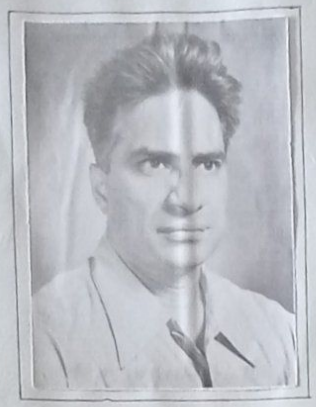

দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি

রোমিলা থাপার

ইরফান হাবিব

দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বী এমন একজন ঐতিহাসিক নাম যিনি ভারতের ইতিহাসকে দেখার প্রচলিত পরিবর্তন দৃষ্টিভঙ্গি ঘটান। তিনি ইতিহাসের লোক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন গণিতবিদ। পরবর্তীকালে ডি. ডি. কোসাম্বী ছিলেন একজন মার্কসবাদী ঐতিহাসিক। দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বী জন্মগ্রহণ করেন 1907 সালে 31 জুলাই গোয়ার কোসবেনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ধর্মানন্দ দামোদর কোসাম্বী একজন বিখ্যাত বুদ্ধিস্ট স্কলার ছিলেন। ডি ডি কোসাম্বী ভারতে কয়েকবছর স্কুল শিক্ষা পাঠ সম্পূর্ণ করার পর তিনি 1918 সালে পড়াশোনা করার জন্য আমেরিকায় চলে যান এবং সেখানে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করে। মার্কসবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী ডি.ডি কোসাম্বী ভাবলেন যে ভারতের ইতিহাসকে সোসিও-ইকোনমিক ভিত্তি আসপেক্ট থেকে দেখা উচিত। ভারতের ইতিহাসকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লিখে ফেললেন একটি ইতিহাস গ্রন্থ তার নাম 'An Introduction to the study of Indian History' প্রকাশিত হয় 1956 সালে। এই গ্রন্থটি পরবর্তীকালে রোমিলা থাপার, রামশরণ শর্মা, ইরফান হাবিব প্রমুখের কাছে প্রশংসা লাভ করছেন। ডি. ডি. কোসাম্বীর আরো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল — 'The culture and civilisation of Ancient India in Historical outline' প্রকাশিত হয় 1965 খ্রিষ্টাব্দে। ঐতিহাসিক ডি. ডি. কোসাম্বী বস্তুবাদী দর্শন ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কসবাদী পদ্ধতিতে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। মার্কসীয় পদ্ধতি অবলম্বন করলেও তিনি প্রাক-আধুনিক ভারতীয় সমাজকে পরিবর্তন বিমুখ না বলে এর পরিবর্তনশীল চরিত্রকে তুলে ধরেন। ভারতবর্ষে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বিরাজমান ছিল তিনি বস্তুবাদী উৎপাদন সম্পর্কে পরিবর্তনের ধারার ওপর ইতিহাস নির্ভরশীল। 1966 সালে 29 জুন পুনেতে এই গণিতবিদ তথা বিখ্যাত মার্কসবাদী ঐতিহাসিকের জীবনাবসান ঘটে।

রোমিলা থাপার ছিলেন একজন ভারতীয় ইতিহাসবিদ হওয়ার সাথে একজন অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক। তাঁর অধ্যয়নের মূলক্ষেত্র প্রাচীন ভারত। রোমিলা থাপার জন্মগ্রহণ করেন 1931 খ্রিষ্টাব্দে 30 নভেম্বর লখনউ প্রদেশে। রোমিলা থাপার এর পিতার নাম দয়ারাম থাপার মাতা কৌশল্যা। ইতিহাসে পরিবর্তনহীনতা বা গতিহীনতার তত্ত্বকে বাতিল করে দিয়ে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসচর্চায় পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন অপর বিখ্যাত মার্কসবাদী ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার। তিনি প্রাচীন ভারতের সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে বহু প্রচলিত ধারনার অবসান ঘটিয়েছেন বাস্তব ভিত্তিক গবেষণার আলোকে। আর্যদের আদি বাসস্থান, অশোকের 'ধম্ম'-র পটভূমি, মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন, প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রের ধারণা, গুপ্ত যুগকে স্বর্ণযুগ বলার প্রচলিত ধারনা এবং সর্বোপরি ইতিহাসচর্চার পদ্ধতি সম্পর্কে বহু মৌলিক ও বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করেছেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনে অশোকের দায়িত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ না করে রোমিলা থাপার মৌর্য শাসন ব্যবস্থার অতি-কেন্দ্রীভূত চরিত্র এবং আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কারণের ওপর জোর দিয়েছেন। এছাড়া বৌদ্ধরা নারীদের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শনের বিষয়টি তুলে ধরেন। তাঁর অসংখ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল — 'Asoka and the Decline of the Mauryas' 1968 খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'Ancient India social History' 1978 খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত গ্রন্থগুলিতে তিনি প্রাচীন ভারতে গতিহীনতার তত্ত্বকে গ্রহণ না করে অর্থনৈতিক কাঠামোয় পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের বিষয়টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস নিয়েছেন।

ইরফান হাবিব একজন কমিউনিস্ট মনোভাবসম্পন্ন ঐতিহাসিক। ভারতীয় মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন 10 আগস্ট, 1931 খ্রিষ্টাব্দে বরোদা শহরে। তিনি ছিলেন আলিগড়ের নাগরিক। ইরফান হাবিবের পিতার নাম মহম্মদ হাবিব, একজন মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ছিলেন এবং কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া সিপিআই-এর ভাবাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মাতার নাম সোহেলা হাবিব। তিনি সায়রা হাবিব নামে এক মেয়েকে বিবাহ করেন, তাঁর সন্তানের নাম সামান হাবিব। ইরফান হাবিবের দাদাজী মহম্মদ নাসিম একজন ধনী ব্যারিস্টার এবং কংগ্রেস দলের সদস্য ছিলেন। ইরফান হাবিব ছিলেন একজন বিখ্যাত মার্কসবাদী ঐতিহাসিক। তিনি 1982 সালে Watumull Prize পুরস্কার পান এছাড়াও Padma Bhushan 2005 সালে উপাধি পান। ইরফান হাবিবের লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম হল — 'Mehangahh Harappa sabhyataghamin Patabhumi', 'Nibbachita Phabandha sudhir chakraborty'.

Name — Rubina Khatun
1st sem, History
Honours, $CC_1$
Reg No — 036562

HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT GEN DEG COLLEGE TEHATTA

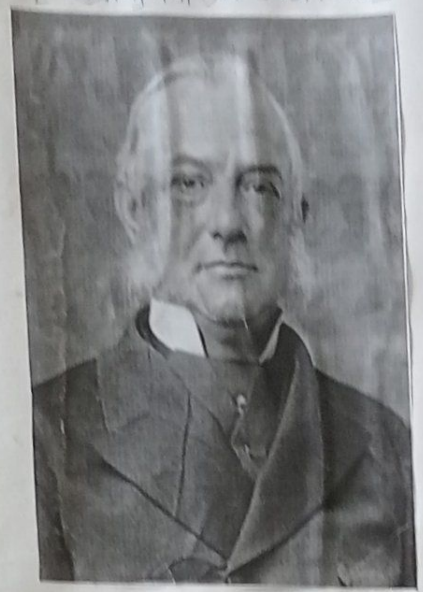

প্রাচীন ভারতে আত্মানুরাগী ঐতিহাসিকদের প্রতি উপনিবেশবাদ বিরোধী ঐতিহাসিক হল - স্যার উইলিয়াম উইলসন হান্টার, ম্যাক্স মুলার ও জন স্টুয়ার্ট মিল। নিম্নে ঐতিহাসিকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হল —

## প্রাচীন ভারতে আত্মানুরাগী ঐতিহাসিকদের ভাষ্য

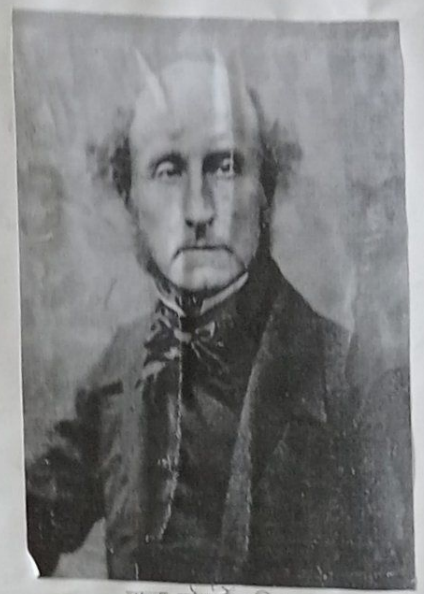

[ আত্মানুরাগী ঐতিহাসিকগণ ]

Name: Rinta Mondal
Roll - 5
Class - 1st History
Registration Number - 036560



স্যার উইলিয়াম উইলসন হান্টার



ম্যাক্স মুলার



জন স্টুয়ার্ট মিল

| | |
|---|---|
| জন্ম | ১৫ জুলাই ১৮৪০ গ্লাসগো স্কটল্যান্ড, UK |
| মৃত্যু | ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০০ (বয়স ৫৯) Oaken Hall, ইংল্যান্ড UK |
| জাতীয়তা | ব্রিটিশ |
| মাতৃশিক্ষায়তন | গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় |
| বৈজ্ঞানিক কর্মজীবন | |
| কর্মক্ষেত্র | ইতিহাসবেত্তা, পরিসংখ্যানবিদ |
| প্রতিষ্ঠানসমূহ | ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় |

**পরিচয়:** হান্টারের পিতার নাম ছিল অ্যান্ড্রু হান্টার, তিনি উৎপাদন শিল্পের সাথে জড়িত ছিলেন। সাত পিতার পুত্রের মধ্যে হান্টার ছিলেন দ্বিতীয়।

**শিক্ষা:** গ্লাসগোর কুইন্সউড বোর্ডিং স্কুলে 1854 সালে তাঁর শিক্ষাজীবনের শুরু। এক বছর পর তাঁকে গ্লাসগো অ্যাকাডেমিতে ভর্তি করা হয়। হান্টার 1860 সালে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. ডিগ্রী অর্জন করেন। তারপর তিনি প্যারিসে, ল্যাটিন ভাষা, গ্রিক ভাষা, যুক্তিবিদ্যা, নৈতিক দর্শন ও নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। 1862 সালে হান্টার ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন।

**খ্যাতি:** এই বিখ্যাত স্কটিশ ইতিহাসবিদ, পরিসংখ্যানবিদ, সংকলক ও ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের সদস্য উইলিয়াম উইলসন হান্টার, সবচেয়ে বেশি পরিচিত 'দি ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া' জন্য, যেটি 1869 সালে প্রবর্তন করেন এবং 1881 সালে প্রথম নয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর আরো 26 খণ্ড পুনরায় প্রকাশিত হয়। লেখক হিসেবে তাঁর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক অবদান হল, 'দ্য ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থটি রচনা।

উইলিয়াম উইলসন হান্টারের লেখা কিছু গ্রন্থের নাম হল —

1. The Indian Musulmans - 1871
2. Annals of Rural Bengal - 1868
3. A History of British India - 1899
4. A Statistical Account of Bengal - 1871
5. The Ran of Maya - 1891

HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT GEN DEG COLLEGE TEHATTA

| | |
|---|---|
| জন্ম | ফ্রিডরিখ ম্যাক্স মুলার ৬ই ডিসেম্বর, ১৮২৩ ডেসাউ, আনহাল্ট, জার্মানি |
| মৃত্যু | ২৮শে অক্টোবর, ১৯০০ অক্সফোর্ড, ইংল্যান্ড |
| পেশা | জার্মান পণ্ডিত |
| পরিচিতির কারণ | ভারত বিদ্যাবিশারদ, দার্শনিক, ভাষাতত্ত্ববিদ, অধ্যাপক, সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত জার্মান পণ্ডিত, প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ও অনুবাদক |

**পরিচয়:** তিনি অন্যতম ভারত বিদ্যাবিশারদ, দার্শনিক, ভাষাতত্ত্ববিদ, অধ্যাপক, সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত জার্মান পণ্ডিত, প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ও অনুবাদক ছিলেন। তাঁর পিতা উইলহেম মুলার ছিলেন অন্যতম বিশিষ্ট রোমান্টিক কবি ও সাহিত্যিক। তাঁর মা অ্যাডেলহাইড মুলার ছিলেন অ্যানহাল্টডেসাউ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর জ্যেষ্ঠা কন্যা। তাঁর স্ত্রী র নাম জর্জিনা অ্যাডিলেইড গ্রেনফেল এবং তাঁর পুত্রের নাম ছিল উইলহেম ম্যাক্স মুলার।

**শিক্ষা:** 1841 সালে লিপজিগ নগরে স্কুলজীবন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন বিভিন্ন প্রাচীন ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে। পরবর্তীকালে তিনি 1843 সালে 'লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে পি. এইচ. ডি. এবং 'ডক্টর অব ফিলোজফি' উপাধি লাভ করেন।

উল্লেখিত ম্যাক্স মুলারের লেখা কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম হল —

1. India, What can it Teach Us? - 1882
2. The Six Systems of Indian Philosophy - 1899
3. Thoughts on Life and Religion - 1905
4. Deutsche Liebe - 1858
5. India - 1883, 6. The Science of Thought - 1887

**সম্মাননা:** [illegible] ও ইংরেজি 'সংস্কার কমিটি' নামে উপাধি পেয়েছেন; [illegible] 1896 [illegible] [illegible] [illegible]। তাঁদের স্মরণে [illegible] [illegible] [illegible] 'ইন্টারন্যাশনাল' [illegible] এবং নাম পরিচিত হয়ে আছে।

| | |
|---|---|
| জন্ম | ২০মে ১৮০৬ পেন্টনভিল, লন্ডন, ইংল্যান্ড |
| মৃত্যু | ৭ মে ১৮৭৩ (বয়স ৬৬) অ্যাভিনন, ফ্রান্স |
| জাতীয়তা | ব্রিটিশ |
| দাম্পত্য সঙ্গী | হ্যারিয়েট টেইলার |
| অঞ্চল | পাশ্চাত্য দর্শন |
| ধারা | অভিজ্ঞতাবাদ, উপযোগবাদ, উদারনীতিবাদ |

| | |
|---|---|
| প্রধান আগ্রহ | রাজনৈতিক দর্শন, নীতিশাস্ত্র, অর্থনীতিবিদ্যা, আরোহমূলক তর্ক |
| উল্লেখযোগ্য অবদান | সর্বজনীন / ব্যক্তিগত এলাকা, উপযোগবাদে সুখের শ্রেণীবিভাগ, উদারনীতিবাদ, অন্য উদারনৈতিক নারীবাদ, ক্ষতি নীতি, মিলের পদ্ধতি |

**পরিচয়:** স্কটিশ দার্শনিক, ইতিহাসবিদ এবং অর্থনীতিবিদ জেমস মিল এবং হ্যারিয়েট বুরো দম্পতির জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল। তিনি পিতার তত্ত্বাবধানে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

জন স্টুয়ার্ট মিল ছিলেন অন্যতম ইংরেজ দার্শনিক, রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ এবং সরকারী কর্মকর্তা। উদারনীতিবাদের ইতিহাসের ক্ষেত্রে অন্যতম সেরা প্রভাবশালী চিন্তাবিদ, তিনি সামাজিক তত্ত্ব, রাজনৈতিক তত্ত্ব, এবং রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ্যাতে বহু অবদান রেখেছেন।

জন স্টুয়ার্ট মিলের কিছু গ্রন্থের নাম ও তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা হল —

1. The Subjection of Woman - (1869)

(মিল দেখাতে চান যে, নারীদের প্রতি বিদ্যমানী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি নারীদের [illegible] আন্দোলনে লক্ষ্য নিয়ে শুরু করেন 'The Subjection of Woman'. নারীর জীবনে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] পুরুষদের সমতুল্যতার অনুসরণ, শিক্ষা এবং বিয়ে।)

2. On Liberty - (1859)

('On Liberty' ইংরেজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিলের একটি দার্শনিক পুস্তক। 1859 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি সমাজ ও রাষ্ট্রের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।)

3. Three Essays On Religion - (1874)

([illegible] [illegible] [illegible] 'উপযোগিতা' ও আস্তিকতা নিয়ে আলোচনা [illegible] [illegible] [illegible] সমালোচনার [illegible] [illegible] প্রকাশিত হয়েছে।)

Semester - 1
History Hons - CC-1

Rinku Mandal

# হরপ্পা সমকালীন ও হরপ্পা-পরবর্তী তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতি

**হরপ্পা সমকালীন তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতি:** সিন্ধু অববাহিকা ও অন্যান্য স্থানে যখন এক উন্নত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তখন ভারতবর্ষের কয়েকটি অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির উদ্ভব হল দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থানে, মধ্যপ্রদেশে, ঊর্ধ্ব ও মধ্য গাঙ্গেয় অববাহিকায় এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায়। হরপ্পাবাসীদের মতো উন্নত জীবনযাত্রাও এদের ছিলনা। এই সভ্যতার উদাহরণ হল আহার ও কায়থা সংস্কৃতি।

**আহার বা বনাস সংস্কৃতি:** রাজস্থানের উদয়পুরের নিকটবর্তী আহারকে কেন্দ্র করে হরপ্পা যুগে বনাস ও তার উপনদীগুলির তীরে (দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থান) যে উন্নত তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তাকে আহার সংস্কৃতি বলা হয়। এই সংস্কৃতি বনাস সংস্কৃতি নামেও পরিচিত। এই সংস্কৃতির ব্যাপ্তি ছিল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব 3000 থেকে 1300 অব্দ। এই সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হল আহার, গিলুন্দ। আহারে নানা ধরনের মাটির পাত্র পাওয়া গিয়েছে এদের মধ্যে কোনওটি লাল ও কালো, কোনওটি শুধুই লাল আবার কোনওটি শুধুই কালো এবং পাত্র গুলির গায়ে সাদা ছবি আঁকা।

**কায়থা সংস্কৃতি:** আনুমানিক 2000 খ্রিস্টপূর্বাব্দে মধ্যপ্রদেশের কায়থা অঞ্চলে এক ধরনের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, তাই একে কায়থা সংস্কৃতি বলা হয়। এই রকমই একটি সংস্কৃতি হল মালবের কায়থা সংস্কৃতি। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে এখানে একশোরও বেশি প্রাগৈতিহাসিক গ্রামীন কেন্দ্র পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল কায়থা ও নবদাতোলি। এই সংস্কৃতির মৃৎপাত্র গুলির বৈশিষ্ট্য হল লালরঙের মৃৎ পাত্রের উপর গাঢ় বাদামি রঙের ছবি আঁকানো।

**হরপ্পা-পরবর্তী বা পরবর্তী হরপ্পা সংস্কৃতি:** হরপ্পা সভ্যতার পরিণত পর্যায়ের সমাপ্তির (আনুমানিক 2000 খ্রিস্টপূর্বাব্দ) পর প্রবীনত হরপ্পা সভ্যতার অঞ্চলে হরপ্পা সভ্যতার এক পরিবর্তিত রূপের বিকাশ ঘটেছিল। আনুমানিক 750 খ্রিস্টপূর্বাব্দে বর্তমানে এই সংস্কৃতিকে হরপ্পা-পরবর্তী সংস্কৃতি বলা হয়। হরপ্পা-পরবর্তী সংস্কৃতিতে পরিণত হরপ্পা সভ্যতার অনেক বৈশিষ্ট্যই বর্তমান ছিল, কিন্তু তার আকার ও মান হ্রাস পেয়েছিল। যেমন - নগরের আয়তন কমে গিয়েছিল, পাত্র পুরু হয়ে গিয়েছিল, লিপি চিহ্ন কেবল মাটির পাত্রের উপর উৎকীর্ন হতো। এই সংস্কৃতির উদাহরন হল - সিন্ধু অঞ্চলের ঝুকর সংস্কৃতি ও পাঞ্জাব অঞ্চলের সমাধিক্ষেত্র এইচ সংস্কৃতি।



**গৈরিক মৃৎপাত্র সংস্কৃতি:** আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব 2800-2000 সময়কালে উত্তর-পূর্ব রাজস্থান থেকে উত্তর প্রদেশের পশ্চিম প্রান্তে যে-তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতি বিকাশলাভ করেছিল তা এই সংস্কৃতির মাটির পাত্রের গেরুয়া রঙের কারণে গিরিমাটি রঞ্জিত মৃৎপাত্র সংস্কৃতি নামে পরিচিত। এই সংস্কৃতির অবশেষ পাওয়া গিয়েছে মোর্টপুরা, সিসওয়াল, সাই পাই প্রভৃতি স্থানে। এই ধরনের পাত্রের সব রং যে গৈরিক তা নয়, কিছু কিছু পাত্র লাল ও হলদে বর্ণের।

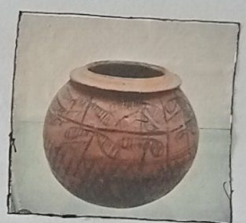

**সমাধিক্ষেত্র এইচ বা সেমেটারি এইচ সংস্কৃতি:** হরপ্পা সভ্যতার পরবর্তী স্তরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তাম্র প্রস্তর যুগীয় সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিলো এবং বিভিন্ন অঞ্চলে এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। হরপ্পার উত্তরাধিকারী সংস্কৃতি হিসেবে গড়ে উঠেছিল সেমেটারি এইচ সংস্কৃতি। হরপ্পা ও বাহাওয়ালপুর জেলার ~~বিভিন্ন~~ বিভিন্ন এলাকায় এই সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটেছিল। এই সংস্কৃতির মাটির পাত্রগুলি ছিল লাল রঙের। সমাধি নির্মানে এদের উপর হরপ্পার প্রভাব ছিল।



**জোরউই বা জোরয়ে সংস্কৃতি:** মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে পরবর্তী তাম্রপ্রস্তর যুগীয় সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। এখানকার প্রত্নক্ষেত্র গুলি হল আহমদনগর জেলার জোরয়ে, নেভাসা, পুনা জেলার ইনামগাঁও, সোনাগাঁও, চাঁদলি এবং নাসিক। জোরয়ে ছিল এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই সংস্কৃতির সময়কাল 1400 খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে 1100 খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। উজ্জ্বল ও মসৃন কালো নক্সা কাটা লাল-কমলা এবং ধূসর রঙের মৃৎপাত্রের অবশেষ এখান থেকে পাওয়া গেছে। এবং এখানকার মানুষ কাপড় বোনার কৌশল আয়ত্ত করেছিল।

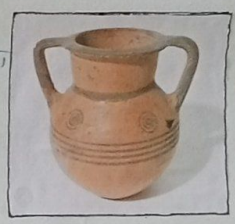

**ঝুকর সংস্কৃতি:** হরপ্পা - পরবর্তী সময়ে ভারতে যে-তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তার অন্যতম হচ্ছে সিন্ধু প্রদেশের ঝুকর, চানহুদড়ো প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত ঝুকর সংস্কৃতি, এই সংস্কৃতির সময়কাল আনুমানিক 2000-2000 খ্রিস্টপূর্বাব্দ। এই সংস্কৃতি হরপ্পা সভ্যতা অপেক্ষা কম উন্নত ছিল। হরপ্পা সভ্যতার পরম্পরা বর্তমান থাকলেও এই সংস্কৃতিতে তার মান ও সংখ্যার পরিমান হ্রাস পেয়েছিল।

HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT GEN DEG COLLEGE, TEHATTA

1st Sem
History (H)
Rinku Mandal
Roll - 10

# HISTORY

## CC—1

## বিষয় — হরপ্পার ধর্মীয় জীবনে আদিশিবের ভূমিকা

**ভূমিকা :–** প্রাচীন ভারতের ইতিহাসচর্চায় হরপ্পা সংস্কৃতির আবিষ্কার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীন ও পদুপূর্ণ নগরায়নের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। এই আবিষ্কারের ফলে ভারতের ইতিহাস সংস্কৃতির দিগন্তকে প্রসারিত করে তার প্রাচীনত্ব ও মৌলিকত্ব তুলে ধরেছেন।

**হরপ্পার ধর্মীয় জীবন :–** হরপ্পার সভ্যতায় মন্দিরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ আছে। কয়েকটি অট্টালিকাকে মন্দির বলে মনে করেন। ডঃ ব্যাসাম বলেন সিন্ধু অঞ্চলে কোনো দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া যায়নি এবং অন্য কোনো ধর্মীয় স্মৃতি চিহ্ন সিন্ধু অঞ্চলে পাওয়া যায়নি। তবে হরপ্পার ধর্মীয় জীবনে বহু নারী মূর্তি ও প্রস্তর মূর্তির উপর নির্ভর ছিল।

**হরপ্পার ধর্মীয় জীবনে আদিশিব এর ভূমিকা :–** সিন্ধু উপত্যকায় অসংখ্য দণ্ডায়মান নারীমূর্তি পাওয়া গেছে। মনে করা হয় হরপ্পা বাসীরা মাতৃমূর্তি পূজা করতেন। বিভিন্ন দেবদেবীকে প্রসন্ন করার জন্য ও প্রার্থিত বলে আনার জন্য তেল অথবা ধূপ জ্বালানো হতো। হরপ্পা প্রাপ্ত একটি শীলে বাঘ, হাতি, মোষ, গন্ডার, ও হরিণ এই পাঁচটি পশু বেষ্টিত এক মুখ বিশিষ্ট এক ধ্যানমগ্ন এক যোগী মূর্তি দেখা যায়। অধ্যাপক ডঃ ব্যাসাম একে আদিশিব বলে অভিহিত করেছেন।

**হরপার ধর্মীয় জীবনে অন্যান্য প্রানীর উপাসনা :–** হরপ্পা সভ্যতার ধর্মীয় জীবনে যে দিক নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই তাহল বিভিন্ন প্রানীর ~~উদাহরন~~ উপাসনা। এই প্রানীগুলি অধিকাংশ ছিল পৌরাণিক। এই গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — একশৃঙ্গ প্রানী, চতুষ্পদ প্রানী, ইউনিক নামে পরিচিত। হরপ্পা সভ্যতায় বৃক্ষ পূজার সম্ভবত প্রচলন ছিল। একটি শীলে সাহায্যে অশ্বত্থ গাছ পাতার দুপাশে শিল কাহারও ও বৃক্ষপাত্র প্রায় দেখা যায়। বৃক্ষ আগুন জল বিভিন্ন জীবজন্তুর লিঙ্গ ও যোনি পূজা এবং সম্ভবত সূর্য উপাসনাও প্রচলিত ছিল।

Name — Labani Mondal Registration No — 036554
Class Roll No — 06

HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT. GEN. DEG COLLEGE ...

Name - Sohan Halder
Roll - 7 / (CC-1)
Reg - ...

# মগধের উত্থানের কারণসমূহ :-

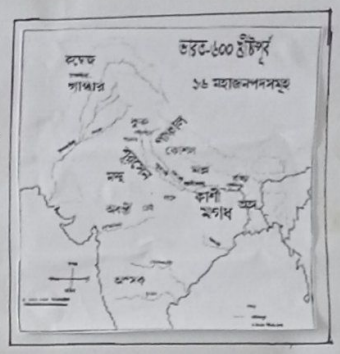




বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ এবং হিন্দু পুরাণ থেকে জানা যায় যে খ্রিঃপূর্ব ষষ্ঠ শতকে উঃ ভারতে কোন কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অস্তিত্ব ছিল না, উঃ ভারতে ঐ সময় ছোট বড় ১৬টি রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল, তাদের একত্রে 'ষোড়শ মহাজনপদ' বলা হয়। ষোড়শ মহাজনপদের রাজ্যগুলি সর্বদা নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাদের শক্তি ক্ষয় করত, এর মধ্য দিয়েই ক্রমে অবন্তী, বৎস, কোশল, মগধ এই চারটি রাজ্য বা জনপদ বাকি জনপদগুলির চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে, অবশেষে মগধ অপর তিন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যকে ধ্বংস করে সমগ্র আর্যাবর্তে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। খ্রিঃপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মগধ শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মগধকে কেন্দ্র করে সর্বপ্রথম এক সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। ঐতিহাসিক D. N. Jha লিখেছেন :- Eventually Magadha Emerged Victorious and Became the centre of Political Activity in North India.

- **মগধের সাফল্যের কারণ :-** হর্যঙ্ক বংশীয় রাজা বিম্বিসারের এর সময় থেকে মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল পর্যন্ত সময়কালে মগধের উত্থান ও সাম্রাজ্যবাদের প্রসার ঘটেছিল।

মগধের উত্থান বা সাফল্যের পিছনে একাধিক কারণ বিদ্যমান ছিল, যথা নিম্নরূপ —

(i) **ভৌগোলিক সুবিধা :-** মগধের উত্থানে যেমন রাজনৈতিক নেতৃত্বের সংখ্যা ছিল বিপুল, অঞ্চল হিসেবে মগধের ভৌগোলিক অবস্থান ও তার পক্ষে এক সুবিধাজনক পরিস্থিতি হয়ে দেখা দেয়। মগধের প্রারম্ভিক অবস্থায় রাজধানী রাজগৃহ পাঁচটি পর্বত দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায়, প্রাকৃতিক সুরক্ষার সুবিধা লাভ করে। মগধের পরবর্তী সময়ে রাজধানী পাটলিপুত্র, গঙ্গা, শোন, গণ্ডক নদী বেষ্টিত হওয়ার সামরিক দিক থেকে সুরক্ষিত হয়। আলোচ্য সময়ে আর কোনো মহাজনপদের এই ভৌগোলিক সুবিধা ছিল না।

(ii) **উপযুক্ত রাজন্যবর্গ :-** মগধের সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য মগধের রাজবংশগুলির ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, মগধে একাধিক রাজবংশ যথা — হর্যঙ্ক বংশ, শিশুনাগ বংশ, নন্দবংশ, মৌর্য বংশ রাজত্ব করেছিল, প্রতিটি রাজবংশই মগধের রাজ্য বিস্তারের দিকে মন দিয়েছিল, মগধের সমস্ত রাজাই মগধের রাজ্য বিস্তার নীতিকে অব্যাহত রাখেন, বিম্বিসার, অজাতশত্রু, শিশুনাগ, মহাপদ্ম নন্দ, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং অশোকের মত অতিশয় যোগ্যতাসম্পন্ন নেতৃবৃন্দ মগধের নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির মূলে ছিলেন, এছাড়াও অজাতশত্রুর মন্ত্রী বাসসকার চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মন্ত্রী কৌটিল্য, অশোকের মন্ত্রী রাধাগুপ্তের মতো কূটনীতি বিশারদদের ভূমিকাকেও উপেক্ষা করা চলে না,

(iii) **কৃষির প্রসার :-** মগধ নদীমাতৃক অঞ্চল, নদীবাহিত পলি মাটি ও যথেষ্ট বৃষ্টিপাতের ফলে সারা বছর স্বাভাবিকভাবেই কৃষিসমৃদ্ধ। নদী গুলিতে বছরের অধিকাংশ সময় জল থাকে, গাঙ্গেয় উপত্যকা কৃষি কর্মের জন্য আদর্শ এলাকা, এই অঞ্চলে লোক সংখ্যা অনেক, কৃষির ফলন বেশি, রোমিলা থাপার এর ভাষায় — "The Possibility of an imperial structure based on an essentially agrarian economy began to germinate in India mind".

(iv) **বৈদেশিক-বাণিজ্য :-**
মগধের বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল সমৃদ্ধ, উঃ ভারতের নদী গুলির উপর ক্রমে মগধের আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল, ফলে নদীপথে প্রতিবেশী রাজ্য গুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা ও পণ্য পরিবহনে মগধের সুবিধা হয়েছিল, গঙ্গা, শোন, চম্পা, প্রভৃতি নদীপথে মগধের বণিকরা দঃ ভারতে, বঙ্গোপসাগর ও দক্ষিণাঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে পাড়ি দিত। স্থলপথেও কাশ্মীর, গান্ধার সহ উঃ পঃ ভারতে দক্ষ-দক্ষিণের সঙ্গে তাদের বাণিজ্য চলত, ফলে মগধের অর্থনীতি সুদৃঢ় হয়েছিল।

— মগধের পূর্বাঞ্চলে ছিল হস্তিসংকুল ঘন অরণ্য, এই অরণ্য ভেদ করে শত্রুর পক্ষে মগধ আক্রমণ করা দুঃসাধ্য ছিল, কিন্তু এই অরণ্য থেকেই

(v) **অরণ্য- সম্পদ :-** হস্তি সংগ্রহ করে নন্দ রাজারা বিশাল রণহস্তিবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন, মগধের সেনাবাহিনীর প্রধান অঙ্গই ছিল হস্তিবাহিনী, সুশিক্ষিত হস্তির সাহায্যে বর্ষার দুর্গম কর্দমাক্ত জলাময় পথ দিয়ে সামরিক বাহিনীর রসদ পরিবহন করা, দাস সংগ্রহ করা মগধের পক্ষে সহজসাধ্য হয়। নন্দদের রণহস্তি বাহিনীর ভয়েই বোধ হয় গ্রিক বীর আলেকজান্ডার বিশ্ববিজয়ী সেনাদল বিপাশার পূর্বদিকে অগ্রসর হতে অস্বীকৃত হয়।

(vi) **খনিজ সম্পদ :-** খনিজ সম্পদে পূর্ণ মগধের তামা ও লোহার খনিগুলি ছিল মগধের আর্থিক সমৃদ্ধি ও সামরিক শক্তির প্রধান উৎস। কেবলমাত্র দৈনন্দিন জীবনে নয় কৃষি যন্ত্রপাতি এবং যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে লোহা ও তামার ব্যাপক ব্যবহার তৎকালীন মগধে প্রচলিত ছিল, কৌটিল্য-র মতে, মগধের লৌহখনিগুলি ছিল তার সামরিক শক্তির গর্ভগৃহ।

(vii) **মিশ্র সংস্কৃতি :-** মগধের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তার রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণকে প্রভাবিত করে। মগধের সীমানার দুই পাশে ছিল আর্য ও অনার্য — দুই পৃথক সংস্কৃতির আবাসস্থল। এর ফলে মগধে এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। মানুষের চিন্তাবৃত্তি উদার ও মুক্ত হয়, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠোরতা এখানে অনেক শিথিল হয়ে পড়ে এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উদারতা জনজীবনকে প্রভাবিত করে। আর্য মানসিকতা ও অনার্য বাহুবলের মিলনে মগধ দুর্বার হয়ে ওঠে।

(viii) **আদর্শবাদ :-** যুগ যুগ ধরে ভারতীয় রাজন্যবর্গ এক ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্ন দেখতেন। তাঁরা সম্রাট, একরাট, বিরাট, সার্বভৌম, রাজচক্রবর্তী প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করতেন। মগধের রাজন্যবর্গও এই আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও অশোকের আমলে এই আদর্শ পূর্ণতা পায়। ঐতিহাসিক ড. রামশরণ শর্মা মগধের উত্থান ও সাফল্যের জন্য প্রাকৃতিক কারণ গুলি উপর বেশি গুরুত্ব দেন। অন্যদিকে মগধের সাফল্যের জন্য ড: এ. এল. বাসাম, রোমিলা থাপার প্রমুখ মগধের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিষয়টিকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন, ড: এ. এল. বাসাম বলেছেন — গঙ্গার উপর একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করার ফলেই মগধ প্রতিবেশী রাজ্য গুলোকে দখলে আনতে পেরেছিল।

HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT GEN DEG COLLEGE, TEHATTA

-: ইতিহাস :-

# PROJECT

## SUBJECT ÷ HISTORY

## CC – 1

(1) হরপ্পা সভ্যতার স্নানাগারের বিবরণ দাও ?

→ বিস্তৃতি :- হরপ্পা সভ্যতার প্রথম স্নানাগারটি মহেঞ্জোদারো শহরটিকে ঘিরে অবস্থিত হয়েছিল। মহেঞ্জোদারো শহরটির পশ্চিমদিকে প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু একটি বিশাল আয়তন ঢিবির উপর একটি দুর্গ ছিল। একে দুর্গশিখর বলা হয়। এই অঞ্চলকে ঘিরে ছিল একটি বিরাট প্রাচীর। কেবলমাত্র মহেঞ্জোদারো বা হরপ্পাই নয় — ছোটো ছোটো বহু নগরেই এই ব্যবস্থা ছিল। এই দুর্গ অঞ্চলে কিছু ঘরবাড়িও আবিষ্কৃত হয়েছে। মনে হয় সেগুলি ছিল শাসকের বাসস্থান। দুর্গ অঞ্চলেই সর্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী একটি বিরাট বাঁধানো স্নানাগার আবিষ্কৃত হয়েছে।

= হরপ্পা সভ্যতার স্নানাগার =

❋ উচ্চতা :- (দৈর্ঘ্য / প্রস্থ) :- হরপ্পা সভ্যতার স্নানাগারটির আয়তন দৈর্ঘ্যে ১৮০ ফুট ছিল। এবং প্রস্থে ১০৮ ফুট ছিল। এর চারিদিকে ঘিরে আছে ৮ ফুট ইঁটের দেওয়াল।

❋ লম্বা ও চওড়া :- (জলাশয়) :- হরপ্পা সভ্যতার স্নানাগারের কেন্দ্রস্থলে আছে একটি জলাশয় যা ৩৯ ফুট লম্বা, এবং ২৩ ফুট চওড়া এবং ৮ ফুট গভীর। জলাশয়ের নোংরা জল নিষ্কাশন ও তাতে পরিষ্কার জল পূর্ণ করার ব্যবস্থা ছিল। ঋতুভেদে জল গরম বা ঠান্ডা করার ব্যবস্থাও ছিল। এই জলাশয়ের জলাধারের তিনদিকে ছিল বারান্দা। এবং একদিকে ছিল ছোটো ছোটো ঘর। জলাশয়ের জলাধারটিতে জল ঢুকাবার ও বের করবার ব্যবস্থাও ছিল।

উপসংহার :- ড: রামশরণ শর্মা (R. S. Sharma) - র মতে, স্নানের পর পোশাক পরিবর্তনের অন্য ঘরগুলি আর মার্টিমার হুইলার মনে করেন, যে, ভারতীয় ধর্মীয় জীবনে স্নানাগারের এবং স্নানের গুরুত্ব অপরিসীম। অপরদিকে ড: দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বী এই কক্ষগুলিকে পণ্ডিতদের বাসস্থান বলে উল্লেখ করেছেন।

NAME :- Sanchu Dawn.
CLASS ROLL :- 5

Registration Number is - 036563.

HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT GEN DEG COLLEGE TEHATTA

# VEDIC LITERATURE

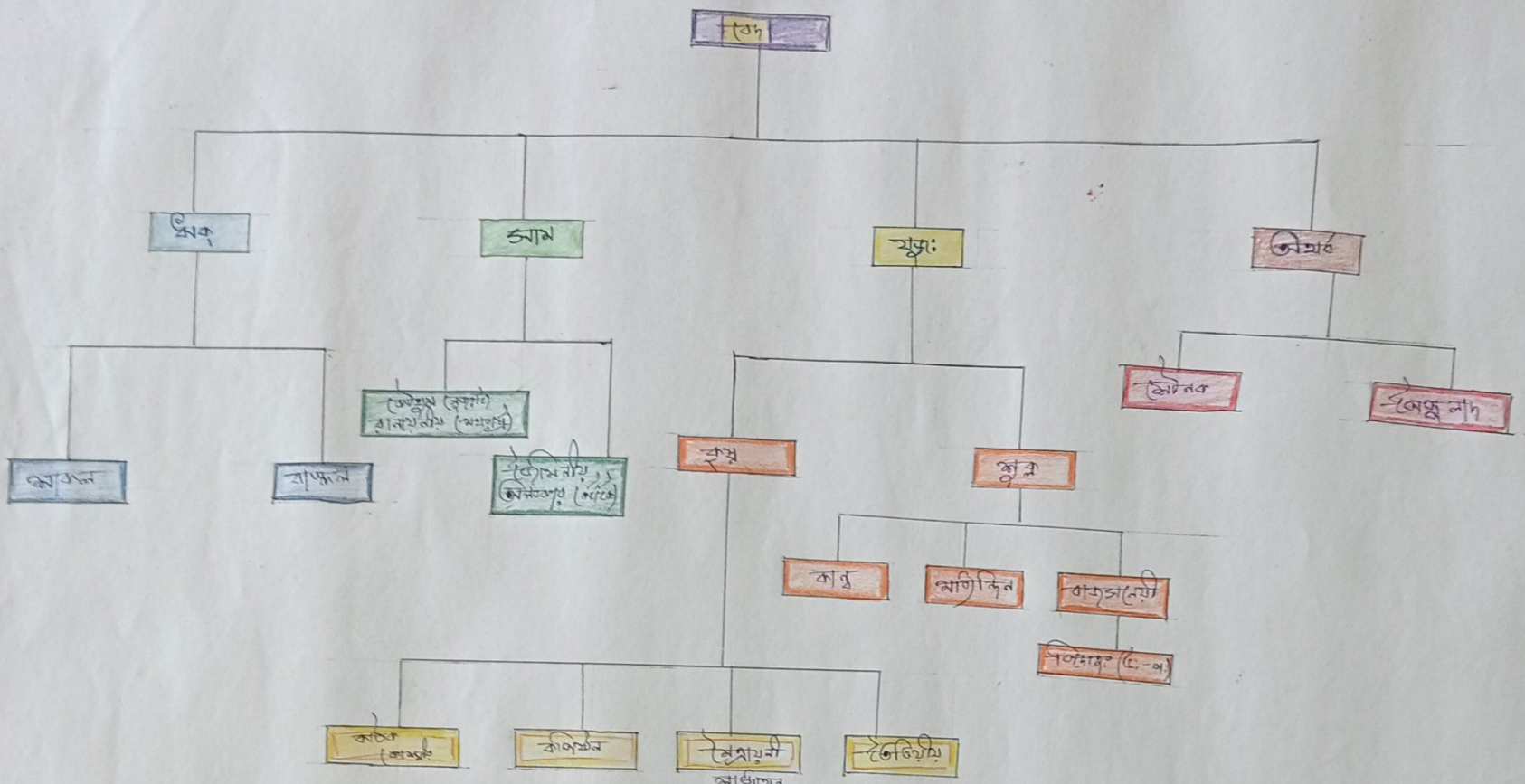




Soumyadeep Halder.

History Honours 1st (Sem)

HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT. GEN. DEG. COLLEGE, TEHATTA

# আজীবিক ধর্ম

**আজীবিক ধর্মমতের উৎপত্তি :-** খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বহু প্রতিবাদী ধর্ম মতের উদ্ভব হয়। এগুলি সংখ্যা ছিল আনুমানিক 60 বা তার বেশি এদের মধ্যে আজীবিক ধর্ম বেশ জনপ্রিয় ছিল। বুদ্ধদেবের সমকালীন একটি প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী সম্প্রদায় ছিল আজীবিক। আজীবিক সম্প্রদায়ের মূল বক্তব্য ছিল মানুষের জীবন নিয়তি দ্বারা পূর্ব নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হয় এবং কোনো বিশেষ কাজ বা সৎকাজ দ্বারা মানুষের দুঃখের বিনাশ হয় না। তাদের মতে চুরাশি লক্ষ বার জন্মগ্রহণের পর মানুষের দুঃখের বিনাশ হয়। অর্থাৎ আজীবিকরা কঠোর অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস করত। এবং অশোকের শিলালিপি থেকে এ কথা জানা যায়। গুপ্ত যুগে ও আজীবিক দের গুহার কথা জানা যায়। আজীবিক ধর্মের প্রবক্তা ছিলেন গোসাল মংখলি পুত্ত। আজীবিক দের কোন ধর্মীয় গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। এই ধর্মের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানা যায় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে।

আজীবিক

**আজীবিক দর্শন :-** আজীবিক ধর্ম বিশ্বাস নাস্তিক্যবাদ এর প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। তারা ও চার্বাক দের মত যাগ-যজ্ঞ, দেব দেবী পুজোর কোন নিয়ম মানত না। আজীবিক দের বিশ্বাস ছিল যে মানুষের কর্মফল হল অখণ্ডনীয়। তারা আত্মায় বিশ্বাস করতো। তাদের মধ্যে জন্মান্তর বাদ টাও ছিল। আজীবিকরা বিশ্বাস করতো যে মানুষ বহু জন্ম সৎভাবে কাটাতে পারলে। তবে নিয়তি বা কর্মফল হাত থেকে নিস্তার পেতে পারে। এমনকি তাদের মতে পণ্ডিত, মূর্খ, গরীব ধনী নির্বিশেষে সবাইকে মোট 84 লক্ষ বার জন্ম গ্রহন করতে হবে। একটি একটি করে জীবনচক্র অতিক্রম করার পর অবশেষে জীবের দুঃখের অবসান হয়। এজন্য আজীবিকরা সন্ন্যাস তপস্যা ও জ্ঞান চর্চার ওপর বিশেষ জোর দেয়। ব্রাহ্মণ ও শূদ্র সকলেই কর্মফলের অধীন। অথাৎ তারা বর্ণপ্রথা এ বিশ্বাসী ছিলেন। আজীবিক ধর্ম ছিল হতাশা থেকে জাত এবং নেতিবাচক। এতে অদৃষ্টবাদ ছিল বড়ই প্রবল মানুষের কর্ম ও উদ্যম এতে শিথিল হয়ে যেত।

**আজীবিক ধর্মের প্রভাব :-** আজীবিক দের কোন ধর্মগ্রন্থ পাওয়া যায়নি। বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রে আজীবিক সম্পর্কে যা বলা আছে তার থেকে আজীবিক দের সম্পর্কে আমরা জানতে পারি প্রথমদিকে আজীবিক দের প্রধান কর্ম কেন্দ্র ছিল। অবন্তি ও অঙ্গ মধ্যবর্তী অঞ্চল। মৌর্য সম্রাট অশোক ও দশরথ জন্য গুহা নির্মান করেন। তাছাড়া অশোকের শিলালিপি তাদের সম্পর্কে জানা যায়। এই শিলালিপিতে তাদের প্রতি সৎ আচরনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজীবিকরা মূলত জাতিভেদ ও শ্রেনীভেদ এর সমালোচনা করার ফলে নিম্নবর্ণের লোকেদের কাছে জনপ্রিয়তা পায়। শূদ্র ও অস্পৃশ্য এই ধর্মের অনুগত্য হয়ে পড়েন। এখানে বলে রাখি যারা অধিক অত্যাচারিত হয়। এই শূদ্র ও অস্পৃশ্য তারাই ভারতবর্ষে যখন ই নতুন কোন ধর্মের উদ্ভব হয়েছে। তারা সেদিকেই ধাবিত হয়েছে। তারা সেদিকেই-পূর্বে জৈন বৌদ্ধ আজীবিক থেকে বর্তমানে খ্রিস্ট ও ইসলাম ধর্ম। আজীবিক ধর্ম বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মতো ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারিনি। আজীবিক সম্প্রদায় যুগ ধর্ম ও সামাজিক পরবর্তীনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারিনি। এই ধরনের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। এই ধরনের প্রবক্তা গোশালের অস্বীকার করা যায় না। জৈন ধর্মের প্রবক্তা মহাবীর। নগ্নতাবাদ গ্রহন করেন। আজীবিক ধর্মের বহু ধারনা ও পরিভাষা। এই ধর্মে প্রবর্তক গোশালে প্রভাবে জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর নগ্নতাবাদ গ্রহন করেন। আজীবিক ধর্মে বহু ধারনা ও পরিভাষা জৈন ধর্মের স্থান লাভ করে। সম্পূর্ন নিয়তি বিশ্বাসী হয়েও বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রবল জনপ্রিয়তা মধ্যেই ছিল আজীবিক ধর্ম দীর্ঘকাল তার অস্তি টিকিয়ে রাখতে সমর্থন ছিল। আজীবিকরা নাস্তিকবাদী থাকায় মানুষের কর্মফল ও ও জন্মান্তর সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ না করায় এর জনপ্রিয়তা কমে যায়।

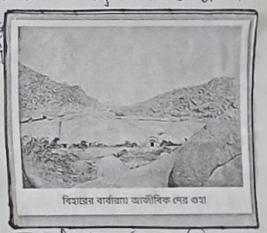



বিহারের বারবারায় আজীবিক দের গুহা

**আজীবিক ধর্মের পতন:-** বৌদ্ধ ও জৈন দের তীব্র বিরোধিতার ফলে আজীবিক ধর্মের বিলুপ্তি ঘটে। আজীবিক রা নাস্তিক্যবাদি হলেও মানুষের কর্মফল ও জন্মান্তর সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ না করায় এই ধর্মের জনপ্রিয়তা বৌদ্ধ ধর্মের তুলানায় কমে যায়। সম্রাট অশোক যখন বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহন করে তখন আজীবিক দের হত্যা করার আদেশ দেয়। নগ্নদেহী এই আজীবিকরা পাত্র নিয়ে ভিক্ষায় বের হতেন এবং দু'হাতে ভিক্ষা গ্রহন করতেন। আজীবিকরা স্বহস্তে চুল উপড়ে ফেলা এবং উত্তপ্ত ধাতু পিণ্ডকে হাত ধারন করার মতো কঠিন কাজ করে আজীবিক ধর্মমতের দিক্ষা গ্রহন করতেন। অনেক সময় এর উপবাসের মধ্যে দিয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরন করতেন। আজীবিকদের হাতে বাঁশের লাঠি থাকত। তাই এদের একদণ্ডিও বলা হত। কিছু কিছু বনিক এবং মহিলারা ও এই ধর্মমতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম এই ধর্মমতের বিরোধীতা করায় এই ধর্মের অবলুপ্তি ঘটে।

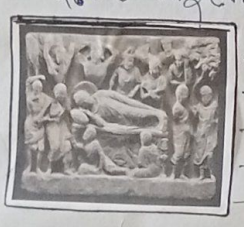



প্রায় 18 হাজার এর মত আজীবিক দের উৎখাত করা হয় তাদের ভূমি থেকে যদিও এই ঘটি বিতর্কিত ও অপ্রামানিক। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে নবজাগ্রত বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে খুব সম্ভবত আজীবিক ধর্ম বিলীন হয়ে গিয়েছিল। আজীবিক ধর্মের প্রবর্তক গোশাল মংখলি পুত্ত মৃত্যু ঘটে 484 খ্রিস্ট পূর্বে।

Barsha Halder, Roll- 18, CC-1. (H-H)

HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT GEN. DEG COLLEGE, TEHATTA

Name - Barsha Halder Roll-No - 17 R.N - 036551

Name-Disha Guin
1st sem History Hons
Roll – 15
Registration No – 036552

# গৌতম বুদ্ধ

জীবনী :– বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তা গৌতম বুদ্ধ উত্তরপ্রদেশের সন্নিকটে নেপালের তরাই অঞ্চলের কপিলাবস্তু রাজ্যে লুম্বিনী গ্রামে ৫৬৩ খ্রীঃপূঃ জন্মগ্রহন করেন। গৌতমের পিতা শাক্য জাতিগোষ্ঠীর নেতা শুদ্ধোদন এবং মাতা মায়াদেবী। বাল্যকালে তিনি মাতৃহারা হন এবং মাসী গৌতমীর দ্বারা লালিত পালিত হন। ষোলো বছর বয়সে গৌতম বুদ্ধ গোপা নামে এক সুন্দরী কন্যার সঙ্গে বিবাহ করেন। বহুল বিলাস ব্যসনে থেকেও তার মনে শান্তি ছিল না। এইসময় তিনি চারটি দৃশ্য দেখেন, যথা– এক জরাগ্রস্থ বৃদ্ধ, এক ব্যধিগ্রস্থ লোক, একটি মৃতদেহ এবং একটি অনিন্দিত প্রান সন্ন্যাসীকে দেখেন। সংসার জীবনের দুঃখের দিকগুলি তার কাছে প্রকাশিত হয়ে যায়। ২৯ বছর বয়সে তাঁর এক পুত্র জন্মলাভ করে। এই পুত্রের নাম ছিল রাহুল। তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি ক্রমশ সংসার ও মায়ার জালে জড়িয়ে পড়ছেন। এজন্য তিনি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহন করেন। এটি মহাবিনিষ্ক্রমন নামে পরিচিত।

সন্ন্যাস জীবন গ্রহন করার পর আরাঢ় কলামা নামে এক সাধক সন্ন্যাসীর কাছে সাংখ্যযোগ, ধ্যান ও তপস্যার বিদ্যা আয়ত্ব করেন। তিনি উপবাসসহ ধ্যান করার কারনে ক্ষীর্ন হয়ে যান ও একদিন মূর্ছিত হয়ে পড়েন। তারপর সুজাতা নামে এক গোপকন্যা তাকে কিছু পায়েস দিলে তিনি তা খেয়ে পুনরায় অশ্বত্থ গাছের নীচে সাধনায় বসেন। দিব্যজ্ঞান বা বোধিলাভ করে তাঁর নাম হয় বুদ্ধ।

বারানসীর কাছে সারনাথে গৌতম বুদ্ধ তাঁর পাঁচসঙ্গীর নিকট তাঁর ধর্মমত প্রথম প্রচার করেন। এই ঘটনা ধর্মচক্রপ্রবর্তন নামে পরিচিত। তিনি বারানসী, রাজগৃহ প্রভৃতি স্থানে বহু লোককে তার ধর্মমতে দীক্ষা দেন। তাঁর পালিকা মাতা গৌতমীর অনুরোধে তিনি ভিক্ষুনী সংঘ গঠন করেন।

৮০ বছর বয়সে কুশীনগরে আনুমানিক 487 খ্রীস্টপূর্বাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। বুদ্ধের মৃত্যুকে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে মহাপরিনির্বান বলা হয়।

বৌদ্ধধর্মের মূল নীতি :–

1. অহিংসা
2. আর্যসত্য
3. পুনর্জন্ম ও কর্মফলবাদ
4. মধ্যপন্থা
5. অষ্টাঙ্গিক মার্গ
6. নির্বান

বৌদ্ধধর্মের সঙ্ঘ ব্যবস্থা :–

1. সংঘ গঠন
2. ভিক্ষুব্রত
3. ধ্যান সংগ্রহ
4. মঠের সংগঠন

বৌদ্ধ সংগীতি :–

1. অজাতশত্রুর আমলে রাজগৃহে
2. কালাশোকের আমলে বৈশালীতে
3. অশোকের আমলে পাটলিপুত্রে
4. কনিষ্কের আমলে কাশ্মীরে

HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT. GEN. DEG COLLEGE TEHATTA

বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র :–

ত্রিপিটক ও জাতক :– বুদ্ধের উপদেশগুলি পালি ভাষায় ত্রিপিটকে সংকলিত করা হয়। তিনটি পিটক হল — 1. সুত্তপিটক 2. বিনয়পিটক 3. অভিধর্মপিটক। সুত্তপিটকের প্রধান বিষয় অবলম্বন করে ধম্মপদ ও জাতকগুলি রচিত হয়েছে।

# মহাবীর

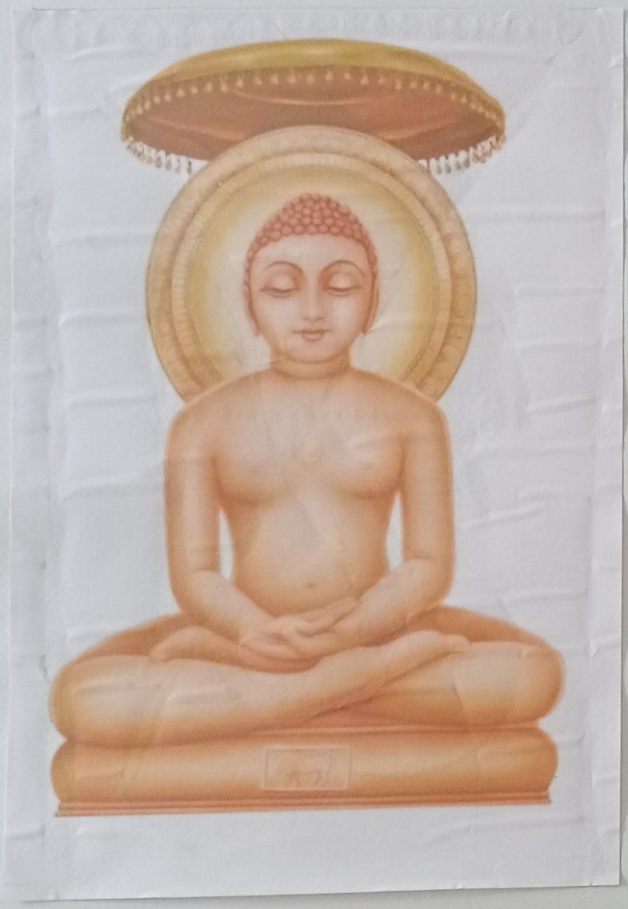



মহাবীর

## মহাবীরের বাণী :-

1. ঈশ্বর বলে কোন কিছু নেই। সর্বশক্তিমান কোন সত্তায় আমাদের বিশ্বাস নেই।

2. অহিংসা এবং সৎ আচরণ সকলকেই পালন করতে হবে।

3. আগুন জ্বালালে যেমন জীব হত্যা করা হয়, আগুন নির্বাপিত করলেও জীব হত্যা করা হয় – এটি হল সবথেকে বড়ো পাপ।

4. আমাদের মূল ঈশ্বর আরাধনা বা স্বর্গপ্রাপ্তি যথেষ্ট নয়, মূল হল তিনটে – সৎ বিশ্বাস, সৎ জ্ঞান, সৎ আচরণ।

5. পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে সমভাবে ভালোবাসতে হবে। ধর্ম - বর্ণ - অর্থে কোন বিভাজন থাকবে না।

6. তথাকথিত ধনী সম্প্রদায়ের মানুষ দরিদ্র সম্প্রদায়কে ভালোবাসবে, তাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। তবেই একটি সত্যিকারের সুস্থিত সমাজ স্থাপিত হতে পারবে।

7. সমাজে উঁচু এবং নীচুর মধ্যে কোনো তফাত থাকবে না।

8. পৃথিবীর সব ধর্মের মূল কথা হল এক – নিজেকে জানা অর্থাৎ নিজেকে উপলব্ধি করা।

9. ধর্মগুলির মধ্যে আপাতত বিরোধ আছে কিন্তু আসলে এদের কোন বিরোধ নেই।

10. নিজেকে বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ বলে মনে করবে। নিজেকে কখন ছোটো বলে) ভাববে না। নিজেকে ছোটো ভাবলে তুমি কখনো আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠতে পারবে না।

11. সবসময় সৎ চিন্তা করবে, সৎ বন্ধুর সান্নিধ্যে আসার চেষ্টা করবে, সৎ ভাবনায় মনকে প্রফুল্ল রাখবে। তাহলে দেখবে তোমার মধ্যে এক আশ্চর্য শক্তির উত্তরণ ঘটে গেছে।

12. ধার্মিক আচরণের দ্বারা মনকে পরিশুদ্ধ করবে। মন পরিশুদ্ধ না হলে আত্মা পরিশুদ্ধ হয় না।

13. সবধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রকাশ করবে। মনে রাখবে পৃথিবীর সব ধর্মই সমান। ধর্মের মধ্যে যে বিভাজন তা আমাদের সৃষ্টি।

14. নিজেকে জানবার চেষ্টা করবে, সব সময় ঈশ্বরের কথা চিন্তা করবে, কিন্তু মনে রাখবে ঈশ্বর তোমার মধ্যে লুকিয়ে আছেন।

15. ইচ্ছে করলে তুমি জগতকে জয় করতে পারো, ইচ্ছে করলে তুমি এমন কাজ করতে পারো যা আর কেউ কখনই করেনি।

16. মানুষ স্বপ্ন দেখে স্বপ্ন পূরণ করতে করতে একদিন অসম্ভবকে সম্ভব করে ফেলে।

17. উদ্দেশ্য রাখবে, উদ্দেশ্য না থাকলে মানুষ জীবন বড়ো হতে পারে না।

HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT GEN DEG COLLEGE TEHATTA

Miluka Pramanik
Roll - 9
History Hons (1st Sem)

# জৈন ধর্ম

Name - Aditi Haldar
Roll - 17
History 1st sem
REGN NO - 036551

**ভূমিকা :-** জৈনধর্ম হলো একটি ভারতীয় ধর্ম। এই ধর্ম সকল জীবিত প্রাণীর প্রতি অহিংসার শিক্ষা দেয়। জৈনধর্মাবলম্বীরা মনে করেন অহিংসা ও আত্ম-সংযম হল মোক্ষ এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি লাভের পথ। "জৈন" শব্দটি এসেছে সংস্কৃত "জিন" শব্দটি থেকে। জৈন ধর্ম শ্রমণ প্রথা থেকে উদ্ভূত ধর্মমত। এটি বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মমতগুলির অন্যতম। জৈনরা তাদের ইতিহাসে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের কথা উল্লেখ করেন। এঁদের শিক্ষাই জৈন ধর্মের মূল ভিত্তি। প্রথম তীর্থঙ্করের নাম ঋষভ এবং সর্বশেষ তীর্থঙ্করের নাম মহাবীর। ভারতে জৈন ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা প্রায় ৩০.২০০,০০০।

**তীর্থঙ্কর :-** একজন তীর্থঙ্কর হলেন এক সর্বজ্ঞ শিক্ষক ঈশ্বর, যিনি ধর্ম শিক্ষা দেন। "তীর্থঙ্কর" শব্দটির আক্ষরিক অর্থ "তীর্থের প্রতিষ্ঠাতা"। জৈনধর্মে "তীর্থ" বলতে বোঝায় "সংসারসাগরের অনন্ত জন্ম ও মৃত্যুর সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত একটি সংকীর্ণ পথ"। জৈনদের মতে, জৈন শিক্ষা ধীরে ধীরে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। তখন এক দুর্লভ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে, যিনি জীবনের একটি পর্যায়ে এসে এই সংসার জয় করার উদ্দেশ্যে গৃহ ও জাগতিক সম্পত্তি পরিত্যাগ করেন।

**চতুর্যাম :-** জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ চারটি নীতি পালনের উপর জোর দিয়েছিলেন যেগুলিকে একত্রে চতুর্যাম বলে। এই চারটি নীতি হল —
১) অহিংসা,
২) সত্যবাদিতা।
৩) অনাসক্তি।
৪) চুরি না করা।

**ত্রিরত্ন :-** জৈন ধর্মানুসারে কর্মবন্ধন ছিন্ন করে কৈবল্য বা মোক্ষলাভ করতে হলে তিনটি আদর্শের অনুশীলন আবশ্যক - সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান, সম্যক চারিত্র। সম্যক দর্শনের অর্থ তীর্থঙ্করদের শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তীর্থঙ্করদের উপদেশ অধ্যয়ন ও পালনের মাধ্যমে অর্জিত হয় সম্যক জ্ঞান। আর সম্যক জ্ঞানের আলোকে জীবন যাপনের নাম সম্যক চরিত্র। ত্রিরত্ন "সিদ্ধশিলা" নামে পরিচিত।

**পঞ্চমহাব্রত :-** জৈন দর্শন অনুসারে মোক্ষলাভ করার জন্য সম্যক চারিত্র লাভ অতি আবশ্যক যা পাঁচটি মহাব্রত অনুশীলনের দ্বারা লাভ করা যায়। এগুলি একত্রে পঞ্চযাম নামে পরিচিত। এই পাঁচ মহাব্রত হল - অহিংসা, সত্যবাদিতা, অনাসক্তি, চুরি না করা ও ব্রহ্মচর্য। প্রথম চারটি নীতি পালনের কথা বলেছেন পার্শ্বনাথ এবং এগুলির সাথে মহাবীর যোগ করেছিলেন ব্রহ্মচর্য।

চিত্র - মহাবীর



**মহাবীর :-** মহাবীরের প্রকৃত নাম বর্ধমান। তিনি চতুর্বিংশ তীর্থঙ্কর যিনি জৈন ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। দূরবর্তী প্রাক-বৈদিক যুগের পূর্ববর্তী তীর্থঙ্করগুলির আধ্যাত্মিক, দার্শনিক ও নৈতিক শিক্ষাগুলি তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। জৈন ঐতিহ্যে বিশ্বাস করা হয় যে মহাবীর খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকে ভারতের বর্তমান বিহারের রাজকীয় ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ৩০ বছর বয়সে সমস্ত বিষয় সম্পদ পরিত্যাগ করেছিলেন এবং আধ্যাত্মিক জাগরণ অর্জনের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং এক সন্ন্যাসী হয়ে উঠেছিলেন। মহাবীর ১২ বছর ধরে তীব্র ধ্যান ও কঠোর তপের অনুশীলন করেছিলেন, তারপর তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, সর্বজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তিনি ৩০ বছর ধরে প্রচার করেছিলেন এবং খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মোক্ষ অর্জনের জন্য জৈনরা বিশ্বাস করেছিলেন যদিও বছরটি সম্প্রদায় দ্বারা পরিবর্তিত হয়। অনেকে মনে করেন তিনি বুদ্ধের সাথে সমসাময়িক ও অর্ধ শতাব্দী বাস করতেন। ১২ বছর কঠোর সাধনার পর ঋজুপালিকা নদীর তীরে জৃম্ভিক গ্রামের কাছে এক শাল গাছের নীচে মহাবীর কৈবল্য লাভ করেছিলেন। মহাবীরের সাধনার প্রথম ৮ বছরে তার সঙ্গী ছিলেন গোশাল মংখলিপুত্র।

HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT GEN. DEG COLLEGE, TEHATTA

HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT GEN. DEG COLLEGE, TEHATTA

# বৈদিক যুগে নারী

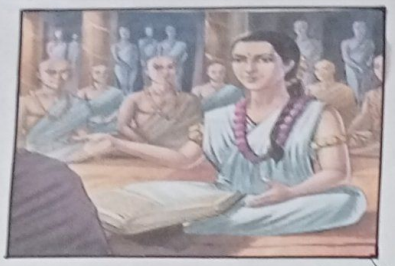



সূচনা~ বৈদিক যুগের সময় কাল সময়কাল আনুমানিক ১৫০০ খ্রীঃপূঃ থেকে ১০০০ খ্রীঃপূঃ, বৈদিক যুগের সম্পর্কে জানার প্রধান উপাদান হল ঋকবেদ, সামবেদ, যজুবেদ, অথর্ব বেদ এবং আরন্যক, উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থাবলী।

## ঋক বৈদিক যুগের নারী~

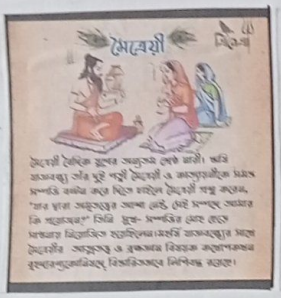






ঋক বৈদিক যুগে আমাদের সমাজের ভিত্তি ছিল পরিবার। ঋক বৈদিক যুগের নারীরা ছিলেন বিশেষ সম্মানের অধিকারিনী। সমাজ পিতৃতান্ত্রিক হওয়ায় পুত্র সন্তান কামনাই স্বাভাবিক ছিল তবে কন্যা সন্তান অবহেলিত ছিল না। তাঁরা বেদ পাঠ ও উপনয়নের অধিকারিনী ছিলেন। নারীরা নৃত্য-গীতে পারদর্শিনী ছিলেন। যুদ্ধবিদ্যাতেও অনেক দক্ষ ছিলেন। সেযুগে নারীদের পাত্র নির্বাচনের অধিকারিনী ছিল, বাল্য বিবাহের চল ছিল না প্রায়। সতীদাহ প্রথা মূলত অভিজাত পরিবারেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই যুগে স্ত্রী শিক্ষার সুযোগ ছিল অপালা, ঘোষা, বিশ্ববারা, মমতা প্রমুখ নারীরা ছিলেন উচ্চ শিক্ষিতা, এই যুগে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারতেন, নারীদের নৈতিকতার মান ছিল উঁচু। নারী ও পুরুষের পোশাকের বিশেষ পার্থক্য ছিল না।




## পরবর্তী বৈদিক যুগের নারী~

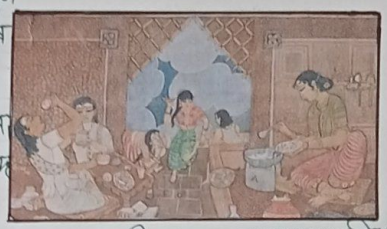

পরবর্তী বৈদিক যুগে অবশ্য নারীর মর্যাদা হ্রাস পেয়েছিল। সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে নারীর অংশগ্রহন সীমিত হয়ে পড়েছিল, এই যুগের বিভিন্ন ব্রাহ্মন্য সাহিত্য ও সংহিতায় নারী সম্পর্কে প্রচুর নিন্দা বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে, তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে যে, নারী অসৎ পুরুষ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, এই যুগে নারীরা উপনয়নের অধিকার এবং অন্যান্য ধর্মীয় কাজে যোগদানের অধিকার হারায়। বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ, সতীদাহ, বিধবা বিবাহ, পণ প্রথা- সবই এই যুগে দেখা দেয়। তবে একথা ঠিক যে, উচ্চ শিক্ষায় নারীরা পিছিয়ে ছিলেন না। অনেক নারী সারা জীবন দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব চর্চা করতেন তাদের বলা হত ব্রহ্মবাদিনী, আর যারা বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যাচর্চা করতেন তাদের বলা হত সদ্যোদ্বাহ। পরবর্তী বৈদিক যুগের কৃতী মহিলাদের মধ্যে গার্গী, মৈত্রেয়ী উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

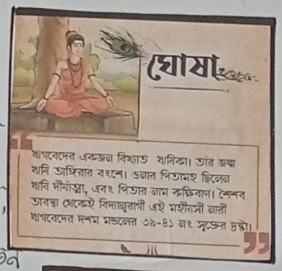

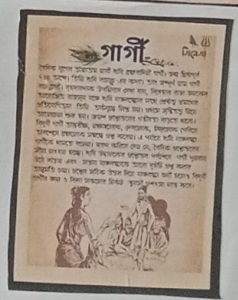







সুতরাং ঋক বৈদিক যুগের তুলনায় পরবর্তী বৈদিক যুগে সামাজিক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন দেখা যায়, পরবর্তী বৈদিক যুগের নারীর মর্যাদা হ্রাস পেয়েছিল ঋক বৈদিক যুগের তুলনায় সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে নারীর অংশগ্রহন সীমিত হয়ে পড়ে।

Govt. Gen. Degree College, Tehatta · Estd-2014 · Govt. of West Bengal

HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT. GEN. DEG. COLLEGE, TEHATTA

CC-1

Misipiya Nasrin Roll-8 Regn-036556

(Soumyadeep Halder.
1S — History (H) Semester — 1st)





# EGYPTIAN PYRAMIDS



## পিরামিড (Pyramids) →

মিশরের একধরনের সমাধি স্থাপত্যকে পিরামিড বলা হয়। চুনাপাথরের চারকোনা খণ্ড দিয়ে ত্রিভুজ আকারে এই স্থাপত্য তৈরী করা হতো। তার পিরামিডের ভিতরে থাকত সমাধি কক্ষ সহ একাধিক ঘর। পিরামিড তৈরী ব্যয় বহুল হওয়ায় প্রাচীন রাজবংশের সময়ে কেবল মাত্র ফ্যারাওরাই পিরামিড তৈরী করতে পারতো। এখানে ফ্যারাওদের মৃতদেহ পরবর্তী জীবনের জন্য সংরক্ষিত করে রাখা হতো।

* তৃতীয় রাজবংশের প্রথম ফ্যারাও জোসের (Djoser) প্রথম পিরামিড তৈরী করিয়েছিলেন।

## ⊛ জোসারের স্টেপ পিরামিড → (Step pyramid)

মিশরের তৃতীয় রাজবংশের প্রথম ফ্যারাও জোসেরের জন্য সাক্কারায় নির্মিত পিরামিডকে তার আকারের জন্য ধাপ পিরামিড বা Step pyramid বলা হয়। প্রতি মাস্তাবার উপর আকারে ছোট একটি মাস্তাবা — এই ভাবে ছয়টি মাস্তাবা নিয়ে এই পিরামিড নির্মিত হয়েছিল। এই পিরামিড চুনাপাথর খণ্ড দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল। স্টেপ পিরামিড 60 মিটার উঁচু এবং এর ভিত্তির আয়তন ছিল 140 m x 118 m. এই বিশাল চত্বরে পিরামিড ছাড়াও আরও অনেক স্থাপত্য এবং মন্দির ছিল।

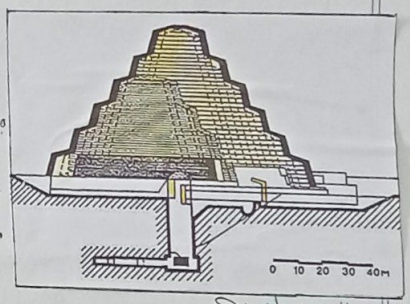




চিত্র → Step pyramid (ধাপ পিরামিড)

## ⊛ বেন্ট পিরামিড → (Bent Pyramid)

মিশরের চতুর্থ রাজবংশের ফ্যারাও স্নেফেরু রাজত্বকালে দহশুর নামক স্থানে একটি পিরামিড নির্মাণ করেন। তার বেঁকে যাওয়া আকারের জন্য পিরামিডটির নাম বেঁকে যাওয়া পিরামিড বা Bent pyramid বলা হয়। চুনাপাথর নির্মিত এই পিরামিডের নীচের 47 মিটার 54° কোণে উঁচু হলেও পরের 43° কোণে উঁচু হয়েছে। এই ভাবে তৈরী হওয়ায় দেখতে মনে হয় পিরামিডটা বেঁকে গেছে।

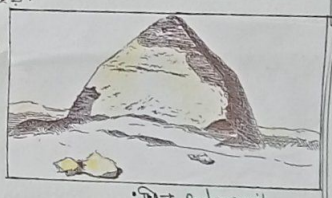



চিত্র → Bent pyramid (বেঁকে যাওয়া পিরামিড)

## ⊛ Red pyramid → (লাল পিরামিড)

মিশরের চতুর্থ রাজবংশের ফ্যারাও স্নেফেরু নির্মিত তৃতীয় পিরামিডটি তার লাল রঙের জন্য লাল পিরামিড নামে পরিচিত। দহশুরে নির্মিত এই পিরামিডটি ছিল প্রকৃত পিরামিড অর্থাৎ চারিদিকের আবরণ ছিল মসৃন। এই পিরামিডের ভিতর লাল চুনাপাথরে নির্মাণ করে বাইরের দিকে সাদা চুনাপাথর লাগানো হয়েছিল। কিন্তু পরে এই সাদা চুনাপাথর খসে যাওয়ায় বেরিয়ে পড়ে লাল চুনাপাথরগুলি দৃশ্যমান হয়েছে। তাই তার পরের এই পিরামিডের পরিচিতি হল লাল পিরামিড নামে। আর ভিত্তির কোণে এই পিরামিডের মসৃণতা লক্ষ্য হয়।

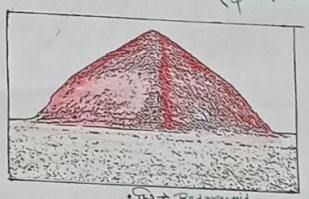



চিত্র → Red pyramid.

## ⊛ The great pyramid of Giza → (গিজার পিরামিড)

চতুর্থ রাজবংশের ফ্যারাও খুফু (Khufu) খ্রীষ্টপূর্ব 2589 – 2566 অব্দে বর্তমান কায়রোর পশ্চিমে গিজা মালভূমিতে এই বিশাল পিরামিড নির্মাণ করেছিলেন। প্রধানত ~~[illegible]~~ শুধু চুনাপাথর দিয়ে বিশাল আকারের তার বইতে উপযোগী ছিল। এই পিরামিড তৈরিতে 2.3 মিলিয়ন সংখ্যক চুনাপাথরের খণ্ড লেগেছিল। যার এদের ওজন ছিল 2 টন, কোনো কোনো 50 টন পর্যন্ত ভারী ছিল। পিরামিডের উচ্চতা ছিল 146.6 মিটার। এর আয়তন পরিমাণ ছিল 2,500,000 কিউবিক মিটার। [illegible] তাপমাত্রা প্রায় একই রকম অবস্থান ছিল। [illegible] র জন্য নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাজানো ছিল।

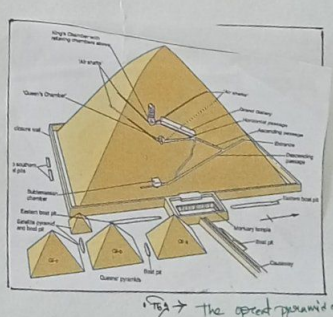




চিত্র → The great pyramid of Giza

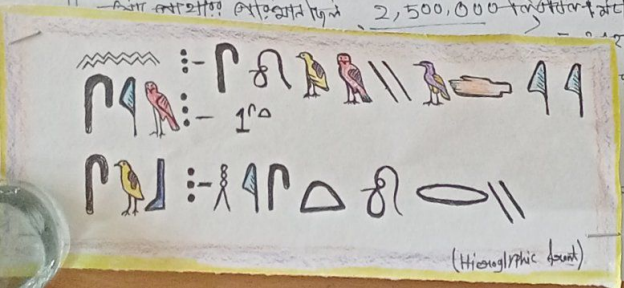



(Hieroglyphic Alphabet)

Govt. Gen. Degree College, Tehatta
Estd-2014
Govt of West Bengal

HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT. GEN. DEG. COLLEGE, TEHATTA

# মমি

**মমি ঃ-**

মমি হলো একটি মৃতদেহ যা জীবের শরীরের নরম কোষসমষ্টিকে জলবায়ু এবং ইচ্ছাকৃত বায়ুর সংস্পর্শ থেকে রক্ষা করে যা মানবিক প্রযুক্তির মধ্যে অথবা প্রাকৃতিকভাবে ধ্বংস এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। মমি হলো ওষুধে মাখানো কাপড়ে জড়ানো মৃতদেহ।

মমি শব্দের উৎপত্তি ঃ—

মমি শব্দটি মধ্য যুগের লাতিন শব্দ mumia থেকে এসেছে, যা আরবী শব্দ মুমিয়া এবং পারস্য ফার্সি ভাষা মোম থেকে আনা হয়েছে যার অর্থ বিটুমিন।

ইতিহাস ঃ-

অধিকাংশ গবেষকের মতে, মমির উৎপত্তিস্থল হলো প্রাচীন মিশর। তবে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতারও এক হাজার বছর পূর্বে উত্তর চিলি এবং দক্ষিণ পেরুর চিনচোরোতে মমির সংস্কৃতি চালু হয়। ওই অঞ্চলের অধিবাসীরা সমুদ্রের মাছ খেয়ে জীবনযাপন করত। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে তাদের বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

মমি তৈরীর পদ্ধতি ঃ—

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে প্রাচীন মিশরীয়রা মমি তৈরীর একটি নির্দিষ্ট নিয়ম বের করেন। কয়েকটি ধাপে এই মমি বানানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হতো। প্রথমে মৃতব্যক্তির নাকের মাঝে ছিদ্র করে মাথার ঘিলু ও মগজ বের করা হতো। এক্ষেত্রে লোহা জাতীয় জিনিসের সহায়তা নেওয়া হতো। তারপর মৃতদেহের পেটের বামপাশে কেটে ভেতরের নাড়িভুঁড়ি বের করে ফেলা হতো। এরপর শরীরের বিভিন্ন পচনশীল অঙ্গ যেমন: ফুসফুস, বৃক্ক, পাকস্থলি ইত্যাদি বের করা হতো। এসব অঙ্গ বের করার পর আবার পেট সেলাই করে দেয়া হতো। এক্ষেত্রে তারা খুব সতর্কতা অবলম্বন করতো। কারণ পেট সেলাই করতে গিয়ে যদি পেটের ভেতর বাতাস ঢুকে যায়, তাহলে মৃতদেহ পচে যাওয়ার আশঙ্কা ছিলো। তারপর মৃতদেহ ও বের করা অঙ্গগুলোতে লবন মেখে শুকানো হতো।

যখন সব ভালোভাবে শুকিয়ে যেতো, তখন গামলা গাইন গাছের পদার্থ ও বিভিন্ন প্রকার মসলা মেখে রেখে দেওয়া হতো। চল্লিশ দিন পর লিনেনের কাপড় দ্বারা পুরো শরীর পেঁচিয়ে ফেলা হতো। এরপর তারা মমিগুলোকে সংরক্ষন করে রাখতো।

মৃতের পরিবারকে 375 বর্গমিটার লিনেন সংগ্রহ করতে হয়েছিল এবং এম্বালমারগুলি সাধারনত হাত এবং পায়ে, তারপর মাথা, বাহু, পা এবং অবশেষে ধড়ের উপর প্রক্রিয়া শুরু করে। একবার প্রতিটি অংশ ঢেকে গেলে, তারা একটি সাধারন স্তর দিয়ে শুরু করবে এবং স্তরগুলির মধ্যে তারা কাপড়টিকে একসাথে আঠালো করার জন্য গরম রজন রাখবে। আচারের সময়, মন্ত্র উচ্চারন করা হয়েছিল এবং আরো শরীরে প্রতিরক্ষামূলক তাবিজ স্থাপন করা হয়েছিল। আর্দ্রতা থেকে সুরক্ষিত ব্যান্ডেজগুলি শরীরকে ধারন করতে সাহায্য করেছিল। এবং আরও বাস্তবসম্মত চেহারা দিয়েছে।

Name - Disha Guin
1st sem History Hons
Roll - 15
Registration No - 036552

Govt. Gen. Degree College, Tehatta
Estd-2014
Govt of West Bengal

HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT.GEN.DEG.COLLEGE, TEHATTA

Name- Rimpa Mondal
Roll - 3
Class - 1st Seem
Registration. Number - 036560

# আজটেক সভ্যতা

মেক্সিকো অঞ্চলে আজটেক জাতির নাম বহুশ্রুত। তাদের সম্পর্কে মূলত আমরা জানতে পারি মেক্সিকোর 'Templo Mayor' প্রত্নক্ষেত্র খনন করে। এছাড়া দেশীয় লেখা ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে এই সভ্যতা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। খ্রিস্টান স্পেনীয় ভিক্ষু ফ্রে জুয়ান দি তোর কিমাডার বিখ্যাত গ্রন্থ Monen Quiana Indiana ও প্রসিদ্ধিকান ভিক্ষু দিয়েগো দুরানের History of Mexico থেকে আজটেক সভ্যতা সম্বন্ধে জানা যায়। এদের প্রথম বসতি ছিল মেক্সিকোর উত্তর বা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত আজলটান অঞ্চলে। মায়াদের জাতির আজটেকরা নাহুয়াতি ভাষায় কথা বলত। বারো শতকের দিকে তারা নতুন বসতির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে ও তেরো শতকের শুরুতে মেক্সিকো উপত্যকায় তারা বসতি স্থাপন করে কিন্তু স্থানীয় শক্তির সাথে সংঘর্ষে বিতাড়িত হয়। শেষপর্যন্ত ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দে তারা লেক টেক্সকোকোর এক ছোট দ্বীপে আবার বসতি গড়ে তোলে। এখানেই তারা পরবর্তীকালে টেনোচটিটলান নামের একটি নগর গড়ে তোলে। ক্রমে তারা টোলটেকদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে এক উন্নত সভ্যতা গড়ে তোলে। আজটেক শাসকরা 'আজটেক' নামে পরিচিত ছিল। পরে তারা নিজেদের মেক্সিকা নামে পরিচিতি দেয়। ১৮১০ সালে আলেকজান্ডার ফন হামবোল্ট প্রথম 'আজটেক' শব্দটি ব্যবহার করেন। 'নাহাতি' শব্দের অর্থ অনুযায়ী যুদ্ধের নেতা ছিল 'মেক্সিতিলি'। এই 'মেক্সিতিলি' হল এবর্বিনের আশ্রয় যা লেক টেক্সকোকোতে জন্মাত। ঐতিহাসিক মিগেল লিওন পোরতিয়ার অবশ্যই মনে করেন যে, মেক্সিকো শব্দের উৎপত্তি মেক্সিতিলি থেকে যার অর্থ 'চাঁদের নাভিমূল'। নাহাতি ভাষায় আবার 'আজটেকা' মানে আজলান থেকে আসা মানুষ।

**সমাজ:** আজটেক সমাজেও তিনটি শ্রেণি ছিল। রাজা, পুরোহিত ও অভিজাতরা ছিল প্রথম শ্রেণী। অভিজাতরা সমগ্র জনগণের মাত্র ৫% হলেও সমস্ত ধরনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। তারা সামরিক বাহিনীতেও নেতৃত্ব দিতেন। অভিজাতরা বংশানুক্রমিক না হলেও সম্পদ, শিক্ষা, খাদ্য ও জীবনের প্রয়োজনীয় সব সুযোগ সুবিধা তারাই ভোগ করত। এদের পিল্লি বলা হতো। অভিজাতরা নিজেদের মান মর্যাদা বাড়াতে উচ্চ অভিজাত পরিবারে বিয়ের চেষ্টা করত। দ্বিতীয় শ্রেণিতে ছিল বণিক ও সম্পন্ন কৃষকরা। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় আজটেক সমাজে মাত্র কুড়ি শতাংশ কৃষক ছিল বাকিরা ছিল হস্তশিল্পী, মূর্তিশিল্পী, কারিগর, কুম্ভকার, সৈনিক প্রভৃতি ও তৃতীয় শ্রেণিতে ছিল কৃষক ও ভূমিদাসরা। তারা অধিকারহীন হলেও স্বাধীন ছিল। যুদ্ধবন্দি দাসেদের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। দাসব্যবস্থা বংশানুক্রমিক ছিল না। দাসেদের ছেলেমেয়েরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। যেসব দাসের উপর অন্যায় হত তারাও স্বাধীন হবার সুযোগ পেত। সমাজে আরেকটি শ্রেণি ছিল যাদের পর্যটনব্যবসায়ী বা পোচতেকা বলা হত। বাণিজ্যের কাজে তারা বণিকদের সাহায্য তো করতই, উপরন্তু, ব্যবসার কাজে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াত বলে অনেক সময়ই তাদের গুপ্তচরের কাজে তাদের ব্যবহার করা হত। সমাজে যোদ্ধা হিসেবে পুরুষদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সমাজে মেয়েদের স্থানও তেমন কম ছিল না। পুরুষদের মতো মেয়েদেরও অনেক সময় বাইরের কাজে করতে দেখা যেত। তাদের মান মর্যাদা, সম্পত্তির অধিকার সবই স্বীকৃত ছিল। যদিও পুরুষদের বহুগামিতাও প্রচলিত ছিল।

**অর্থনীতি:** কৃষি ও পশুপালন ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। আজটেকের অর্থনীতির মূল অংশ কৃষি। সেখানকার আবহাওয়া কৃষির উপযুক্ত ছিল। স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া, অনেক জলাভূমি ও হ্রদের উপস্থিতিতে এখানে অনেক ভুট্টা, মটরশুঁটি, লতাজাতীয় সবজি উৎপন্ন হত। চিনামপাস নির্মাণ করে তারা কৃষিকাজের ব্যাপক উন্নতি করেছিল। বছরে প্রায় সাতরকমের ফসল সেখানে ফলানো হত। আজটেকেরা মানুষরা কৃত্রিম উপায়ে জলসেচ করতে জানত। হ্রদগুলো ছিল তাদের মাছের জোগানের উৎস। তাছাড়া তারা পাখির ডিম ও মাংসও খেতে জানত। তারা চাষের প্রয়োজনে জমিতে সার দিতে, সেচ দিতে জানত। হ্রদ বা নদীর বাঁধের জমিগুলো ছিল যথেষ্ট উর্বর। পাহাড় কেটে ছোট ছোট জমি তারা বানাতে জানত। যন্ত্র বলতে তাদের ছিল কাঠের সরু, সূচালো একধরনের দন্ড; কোদাল, মাটি খোঁড়ার জন্য পাথরের মাপো ও সমতল আকারের পাথরের তৈরি যন্ত্র। তারা চাষবাস করে যে সমস্ত ফসল উৎপাদন করত সেগুলো হল— ফুল, ফল, স্কোয়াশ, টমেটো, বিন, লাউ, লঙ্কা, ধান, তামাক, রবার, ভুট্টা, অ্যাভোকাডো, ক্যাক্টাস, অ্যালাগি প্রভৃতি।

**কারিগরি দক্ষতা:** আজটেকদের শৈল্পিক সত্তা প্রশংসনীয় ছিল। তারা মাটি দিয়ে জিনিস বানাতে জানত। তারা মাটির পাত্রে বিভিন্ন রংও দিত। বস্ত্র বয়ন করতে জানত। তাদের সভ্যতায় আবিষ্কৃত ছোটো ছোটো খেলনা গাড়ি থেকে জানা যায় যে তারা চাকার ব্যবহার জানত। তামা ব্রোঞ্জের জিনিসও তারা তৈরি করতে জানত। কাগজ তৈরি করতে, সংরক্ষণ করতেও তারা জানত। সোনা, রুপোর অলংকার বানানোতেও আজটেক শিল্পীদের কীর্তি প্রশংসনীয়। আজটেকরা রবারের ব্যবহারও জানত। আমেরিকার বনাঞ্চলে জন্মানো ঘৃতকুমারী গাছ থেকে তারা পুলকে বলে একধরনের মদ তৈরি করত।

**পশুপালন:** আজটেকরা হাঁস, কুকুর ও বড়ো বড়ো পাখি শিকার করত। আজটেক অভিজাতদের মধ্যে মাংস খাওয়ার চল ছিল। তারা মৌচাক বানিয়ে মধু উৎপাদন করত ও বিক্রিও করত।

**ব্যবসাবাণিজ্য:** ব্যবসা বাণিজ্যে আজটেকরা বেশ দক্ষ ছিল। কিন্তু তাদের কোনো মুদ্রা না থাকায় তারা সুতোর কাপড়, কাকাও ও লবণের বিনিময়ে কেনাবেচা করত। আজটেক অভিজাতরা বেশ বিলাসী ছিল। তাদের বিলাস দ্রব্য সোনা, তামা, পাখির পালক, রত্নপাথর, বাঘের চামড়া বাইরে থেকে আসত। গুয়াতেমালাতে তাদের বাজার ছিল। পণ্য পরিবহনের কর্মসূচি কাজটি কুলি ও শ্রমিকরাই করত। তাদের সবচেয়ে বিক্রি হত বস্ত্র। এদের বাজারগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল টেনোচটিটলানের কাছে অবস্থিত লাতেলোলকো বাজারটি। আজটেকরা দূরপাল্লাও অভ্যস্ত ছিল বলে জানা যায়। আজটেকের অর্থনীতির উপর উল্লেখযোগ্য দিক হল শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য। আজটেক মহিলারা বস্ত্র শিল্প উৎপাদনে ও পুরুষরা মৃৎশিল্প, কাচশিল্প, পাথর শিল্প, পালকের কাজ ও সংগীতের নানা উপকরণ নির্মাণে যুক্ত ছিল। শিল্পজাত দ্রব্যকে কেন্দ্র করে তাদের বাজার প্রসারিত ছিল। কোনো কোনো বাজার পাঁচদিন বসত, কোনটা আবার রোজ বসত। তাছাড়া নির্দিষ্ট কোনো একটি দ্রব্য নিয়ে বাজার বসার প্রচলন তাদের মধ্যে ছিল। বাজারের নিয়মকানুন রক্ষা করার জন্য বা অনিয়ম দূর করার জন্য তত্ত্বাবধায়করা থাকতেন। দূরবর্তী অঞ্চলে বাজারে ক্রয় বিক্রয়ে নিযুক্ত মানুষগুলোর সুবিধা অসুবিধা দেখাশোনার জন্য 'পকটিকা' 'Pochteca' বলে একটি সংগঠনও ছিল। তারা পাখির পালকের নির্মিত বস্ত্র, মুখোশ, বস্ত্র রপ্তানি করত, অন্যদিকে আমদানি করত 'অবসিডিয়ান' নামে কাচের মতো দেখতে একধরনের আগ্নেয় শিলা, ব্রোঞ্জ ও সোনার জিনিস। তাদের ব্যবসা বাণিজ্যে মুদ্রার ব্যবহারের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। এখানে গড়ে ওঠা নগরগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল টেনোচটিটলান। যেটি তাদের রাজধানীও বটে। বর্তমানে এর নাম মেক্সিকো সিটি।

**রাজনৈতিক ইতিহাস:** ১৩২৫ সালে আজটেকদের প্রথম রাজা ছিল তেনোক। আজটেক সভ্যতার সর্বশক্তিমান শাসক ছিলেন একমাত্লিখটাল। ১৪২৮ সালে শাসক ইটজকোটল সিংহাসনে বসে সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হন ও টেনোচটিটলান, টেক্সকোকো ও টিলাকোপান শহর তিনটিকে নিয়ে আজটেক রাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। ক্রমে প্রায় ৪৮৯টি নগররাষ্ট্র আজটেকদের আনুগত্য মেনে নেয়। যদিও শেষপর্যন্ত ১৫১৯ সালে স্পেনীয় সেনাপতি হারনান কোর্টেজের কাছে এই সভ্যতা চূড়ান্তভাবে পরাস্ত হয়। দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য জুড়ে মায় শাসকদের শত্রুর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হয়েছিল। তাই স্পেনীয়রা যখন তাদের আক্রমণ করেন তখন অনেক পরাজিত জাতি গোষ্ঠী আজটেকদের বিরুদ্ধে স্পেনীয়দের সাহায্য করে।

আজটেক শাসনের ভিত ছিল কেন্দ্র ও আঞ্চলিক শাসকদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্যের সম্পর্ক। সেখানে কোনো কেন্দ্রীয় শাসনের জোরজুলুম ছিল না। বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থায় আঞ্চলিক শাসকরা নিজেরাই শাসককে তাদের খাজনা মিটিয়ে দিত। তাই কেন্দ্রীয় শাসকও অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব অকারণে চাপিয়ে পরিস্থিতি জটিল করত না। সেই অর্থে এই শাসন অনেক নমনীয় ছিল।

আজটেকদের রাজনৈতিক সংগঠনকে বলা হত 'altepeti' বা নগররাষ্ট্র। এই 'altepeti' গুলোর শাসককে বলা হত 'Tnatoani' বা 'ট্লাটোয়ানি'। ট্লাটোয়ানি শাসন করতেন একটি শাসন পরিষদের সাহায্যে, আলটেপিটলটি ছিল আজটেকের সামগ্রিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ— রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের চালিকা শক্তি।

**ধর্ম:** আজটেকদের প্রধান দেবতা ছিল সূর্য। তিনি ছিলেন তাদের যুদ্ধের দেবতা। এছাড়াও হুইটজিলো পোক্টলিও যুদ্ধের দেবতা ছিলেন। এখানে বৃষ্টির দেবতা টিলালকেরও পূজো হত। কৃষিজীবি মানুষেরা বৃষ্টি দেবতাকে খুবই সম্মান করত। তাদের প্রধান মন্দির ছিল টেনোচটিটলান সর্পদেবতা, যার নাম ছিল কোয়েটজালকোয়েটল। তাদের সবকিছুর জন্যই আলাদা আলাদা দেবতা ছিল যেমন— জাদুদেবতা তেজকাটলিপোকা, চিকিৎসা ও শিল্পের দেবতা ছিল বসন্তের দেবতা ছিলেন ইপেতোতেক, আগুনের দেবতা ছিলেন হুয়েহুয়েতেওতল, ভুট্টার দেবতা ছিলেন চিকোমেকাতল ও মৃত মানুষের দেবতা ছিলেন মিকতলানতেকুহতল। যোদ্ধা, অভিজাতরাও সূর্যের দেবতা, সূর্যদেবতা ও যুদ্ধের দেবতার পূজো করত। ধর্মীয় কাজ হিসেবে তারা সঙ্গীত, নাচ ও শোভাযাত্রার আয়োজন করত। তারই মধ্যে যুদ্ধবন্দিদের বলি দেবার প্রথা ছিল।



আজটেকদের সূর্যদেবতা

আজটেক সমাজে পুরোহিতদের খুবই সম্মান ছিল। তারা জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষচর্চা করতেন। আজটেকদের আরেকটি কৃতিত্ব ক্যালেন্ডার তৈরি। তাদের দু ধরনের ক্যালেন্ডার ছিল— ধর্মীয় ও সৌর ক্যালেন্ডার। ক্যালেন্ডার শুরু হত যে উৎসব দিয়ে তার নাম 'Xiunmolpilli' বা নতুন আগুন উৎসব। এই উৎসবে তারা নতুন আগুন তৈরি করে সব বাড়িতে বিতরণ করত। আগুন ছাড়া তারা বাঁচতেই পারত না। আজটেকদের নরবলি দেবার প্রথা ছিল। আজটেকদের নরবলির ধরন ছিল জীবন্ত মানুষের হৃৎপিণ্ড কেটে বের করে সূর্যের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা।




The prisoners captured during war would not be killed but were kept in prison to be later offered as human sacrifice to the Aztec gods.

আজটেকদের নরবলী প্রথা

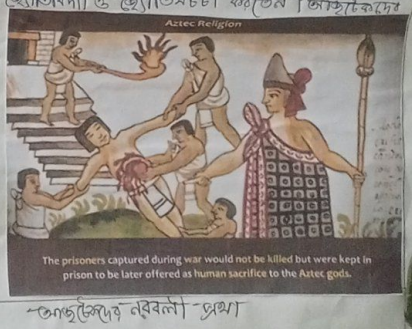

**লিপি:** আজটেকদের লিপিতে চিত্র ও ধ্বনির মিশ্রণ চোখে পড়ে। গাছের ছাল বা কাগজের মতো কিছু একটা তারা ব্যবহার করত লেখার জন্য।

আজটেকদের পতনের কারণ ছিল স্পেনীয় আক্রমণ কিন্তু তাদের নিষ্ঠুর স্বভাবকেও তাদের পতনের কারণ বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেছেন। তাদের নরবলি দেবার প্রথা আশেপাশের মানুষকে নিঃসন্দেহে ভীত সন্ত্রস্ত করেছিল এবং স্পেনীয় আক্রমণের সময় তারা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল। যা তাদের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

Govt. Gen. Degree College, Tehatta * Govt. of West Bengal * Estd-2014

HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT. GEN. DEG COLLEGE, TEHATTA

# রোমের দাস জীবন

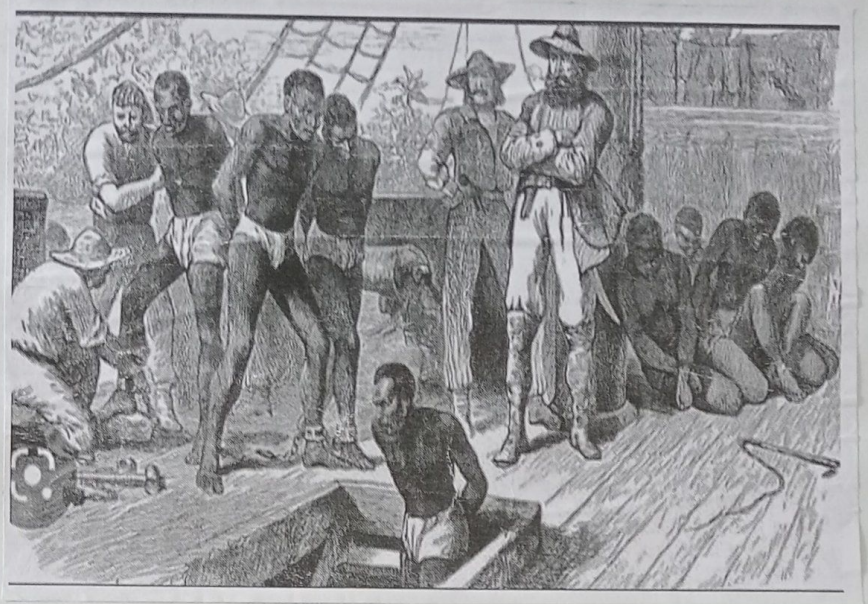



সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারকে কেন্দ্র করে রোমের অধিবাসীদের ৪ ভাগে বিভক্ত করা হয় —
১. নাগরিক, ২. মিত্র বা অধীনস্ত রাষ্ট্রের নাগরিক, ৩. দাস, ৪. স্বাধীন দাস। প্রাচীন রোমের দাসেরা ছিল সম্পত্তি, তাই তারা কোন নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারত না। আর স্বাধীন দাস বা ফ্রিডম্যানরা সমস্ত নাগরিক অধিকার ভোগ করতে না পারলেও তাদের সন্তানদের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করা হত।

☐ গ্রিক ঐতিহাসিক ডায়োনিসাস উল্লেখ করেছেন যে রোমের প্রথম রাজা রোমুলাসের সময় থেকে দাস ব্যবস্থা সূচনা হয়েছিল। তার বর্ণনা অনুসারে রোমুলাস রোমের পিতাদের তাদের সন্তানদের দাস হিসাবে বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাছাড়া তার সময়ে পরাজিত উপজাতি গুলির সদস্যদের দাস হিসাবে ব্যবহার করা হয়। রোমের দাসেরা প্রকৃতপক্ষে ছিল ক্রীতদাস অর্থাৎ যাদের বাজার থেকে কেনা যেত। দাসের কোন সামাজিক রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। প্রভু তাদের ভাড়া খাটাতে ও বিক্রি করতে, হত্যা করতে পারত।

☐ রোমে দাস সংগ্রহ করা হত বাজার থেকে। প্রকাশ্য নিলাম করে অথবা দোকান থেকে দাস বিক্রি করত দাস ব্যবসায়ীরা। অধীনস্ত যুদ্ধে পরাজিত অংশ থেকে এই দাস সংগ্রহ করা হত তাছাড়া দাসদের সন্তানও দাস নামে পরিচিত। রোমে প্রজাতান্ত্রিক শাসন কালে রোমে একটি বন্ধক দাস ব্যবস্থা প্রচলিত হয় যাকে নেকসাম বলা হত। এই ব্যবস্থায় কোন নাগরিক নিজেকে বা তার পুত্রকে দাস হিসাবে বন্ধক রেখে ঋণ সংগ্রহ করতে পারত যদিও ৩২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আইন প্রণয়ন করে এই প্রথা তুলে দেওয়া হয়।

☐ প্রত্যেক যুদ্ধের পরই ক্ষতিপূরণ হিসাবে ১০০০ - ১০,০০০ ক্রীতদাস রোমে আসত। ২৬২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অ্যাগ্রিজেন্টাম দখল করার পর রোম এই অঞ্চলে ২৫ হাজার ক্রীতদাস লাভ করে। পিউনিক যুদ্ধে প্রায় ৭৫০০০ ক্রীতদাস রোমে আসে। এক সময় একটা প্রবাদ চালু হয় — "যত বেশি ক্রীতদাস তত বেশি শত্রু", তাই তারা ক্রীতদাসদের মল্ল যুদ্ধের খেলায় ব্যবহার করত। ২৬৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এরকম একটি প্রদর্শন পর থেকে রোমানরা আরো বেশি রক্তপিপাসু হয়ে ওঠে এর পরবর্তিতে ৬ শতাব্দিতে মল্ল যুদ্ধের রক্তস্নান অব্যাহত থাকে।

☐ প্রাদেশিক কর সংগ্রহ কারি আধিকারিক দের অন্যতম কাজ ছিল এশিয়া মাইনরে শ্রম যোগ্য দাসদের অপহরণ করে ক্রীতদাস বাজারে বিক্রি করা। প্রতিদিন ডেলোসের বাজারে ১০,০০০ ক্রীতদাসের দর হাঁকা হত। তাছাড়া গ্রামের দরিদ্র মানুষ তাদের শিশুকে বিক্রি করতে এখানে আসত। জুলিয়াস সিজার গ্যালিক যুদ্ধে জয় এর পর ৫৩০০০ মানুষকে ক্রীতদাস হিসাবে রোমে নিয়ে আসে।

☐ ক্রীতদাসদের অধিকাংশ কৃষি বা গার্হস্থ্য কাজে নিয়োগ করা হত। এদের মধ্যে যাদের যোগ্যতা থাকত তারা দার্শনিক, শিক্ষক, চিকিৎসক বা স্থপতি ইত্যাদি পেশায় নিযুক্ত হত। তবে যারা বর্বর উপজাতি তাদের মল্ল যুদ্ধে নামানো হত।

☐ তবে রোমের ক্রীতদাসদের বিশেষ করে স্বাস্থ্যবান ও শক্ত ক্রীতদাসদের অস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হত। এরা গ্ল্যাডিয়েটর নামে পরিচিত। এমনকি এক গ্ল্যাডিয়েটর স্পার্টাকাস দাসদের নিয়ে এক সময় বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। তবে এই দাসেরা নির্দিষ্ট কিছু শর্তের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করতে পারত —

১. মালিক খেয়াল তাদের মুক্তি দিলে।
২. প্রভুকে অর্থ প্রদান করে দাসত্ব থেকে মুক্তি কিনতে পারত।
৩. প্রভুর মৃত্যুর পর তার ইচ্ছা পত্র (উইল) অনুসারে তারা মুক্তি লাভ করতে পারত।

☐ তবে পরাধীন দাসদের জীবনে স্যাটার্নালিয়া উৎসব ছাড়া স্বাধীন মানুষের জীবনের স্বাদ গ্রহণ অসম্ভব ছিল।

Govt Gen Degree College, Tehatta · Estd-2014 · Govt of W...

HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT GEN DEG.COLLEGE TEHATTA

Mihika Pramanik
Roll - 9
History Hons (1st Sem)

Name: Sonali Halder
Roll : 7 (CC-2)

Regn : 036567

# -ঃ মিশরের অর্থনীতি ঃ-

তাম্র প্রস্তর যুগে যে নদীকেন্দ্রিক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল মিশরীয় সভ্যতা তার মধ্যে অন্যতম, এই সভ্যতার বিস্তৃতি কাল খ্রিঃ পূর্ব 5000-520 পর্যন্ত। আফ্রিকা মহাদেশের উঃ পূর্ব অংশে যা আমাদের কাছে পরিচিত ইজিপ্ট বা মিশর নামে, নীলনদের তীরে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। হেরোডোটাস মিশরকে নীলনদের দান বলেছেন।

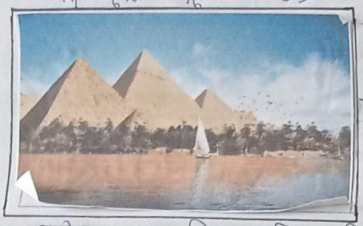



পিরামিডের যুগে মিশরে যে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছিল, তার মূলে ছিল উদ্বৃত্ত কৃষি উৎপাদন, এবং তার উপর নির্ভর করেই শিল্প-বানিজ্য, রাষ্ট্রশাসন প্রভৃতি গড়ে উঠেছিল।

## ● কৃষিকাজ :-

মিশরীয় অর্থনীতি ভিত্তি কৃষি, হলেও শিল্প, ব্যবসাবানিজ্য যথেষ্ট উন্নত ছিল। প্রাচীন রাজত্বে মিশরে কৃষিকাজ ছিল নীলনদের উপর নির্ভরশীল, বাৎসরিক প্লাবন জমিকে প্রয়োজনীয় উপাদানে সমৃদ্ধ তুলত। অতি বন্যা বা স্বল্প বন্যা- দুটিই মিশরের অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকর ছিল। অনেক সময় এর ফলে খাদ্যাভাব, এমনকি দুর্ভিক্ষও দেখা দিত। ইথিওপীয় মালভূমিতে তানা হ্রদে নীলনদের অন্যতম প্রধান শাখা 'ব্লু-নাইল'-এর উৎপত্তি। বর্ষার জলধারায় জুন মাসে এর জলের উচ্চতা বাড়তে শুরু করে। সেপ্টেম্বরে সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছায় এবং নদী উপত্যকা প্লাবিত হয়। জল সরে গেলে অক্টোবর-নভেম্বর নাগাদ ফসল বোনা সম্ভব হয়। নীলনদের উপর নির্ভরশীলতা থেকে মিশরের বর্ষপঞ্জি বা ক্যালেন্ডারে তিনটি ঋতু দেখা যেত। প্রাক্-প্রচলিত 2920-2575 অব্দের মধ্যে এই ক্যালেন্ডারে লিখিত রূপ তৈরি হয়েছিল। বছরের প্রথম ঋতু 'আখেত', যার অর্থ 'বন্যা'। রাতের আকাশে লুব্ধক নক্ষত্র দেখা গেলে মিশরীয়রা বুঝতো বন্যা আসার সময় আসছে। এর পরের ঋতু 120 দিন পরে আসত, এর নাম 'পেরোয়েত' যার অর্থ 'বৃদ্ধি', এটা ফসল বেড়ে ওঠার কাল। আর শেষ ঋতু 'শেমু' যার অর্থ 'ফসল তোলার সময়'। প্রত্যেক ঋতুর সময় সীমা 120 দিন করে। বছরের উপর 360 দিনের পর অতিরিক্ত 5 দিন থাকত। মিশরের কৃষিপণ্যের মধ্যে প্রধান ছিল- গম ও বার্লি, এছাড়াও ডাল, মটর, যব, পিচ, পেঁয়াজ, তরমুজ, মুলো প্রভৃতি। অর্থকরী ফসলের মধ্যে ছিল 'কার্পাস' ও 'শন'। কৃষি জমিতে তিন ধরনের নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা যায়-(i) রাজকীয় (ii) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (iii) ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি। চাষের কাজ মূলত ভূমিদাসরা করত। কৃষকরা তাদের মোট উৎপাদনের 10-20 ভাগ কর হিসেবে সরকারী কোষাগারে দিত। 'শাদুফ' নামের যন্ত্রের সাহায্যে তারা জমিতে সেচের কাজ করত।



## ● পশুপালন :-

নব্য প্রস্তর যুগ থেকে পশুপালনে যে অর্থনীতি চলে এসেছিল প্রাচীন রাজত্বে তা অব্যাহত ছিল। মিশরীয়রা পশুপালনে দক্ষ ছিল। পশু সম্পদের উপর কর আদায় করা হত। যার বেশি পশু তার সামাজিক মর্যাদা তত বেশি ছিল। গৃহপালিত পশুদের মধ্যে ছিল- ভেড়া, ছাগল, গাধা, শুকর, হাঁস প্রভৃতি। মাছ চাষ করত তারা। দুধ ও মাংসের জন্য তারা মৌমাছি চাষ করত। গাধা ও ষাঁড় ভারবাহী পশু হিসেবে ব্যবহৃত হত। কুকুর, বানর ও বনবিড়ালকেও পোষ মানাত তারা। রাজপরিবারে সিংহ রাখত। দেবী হাথোর গো-দেবী ও রক্ষাকর্ত্রী বলে বিশ্বাস করা হত। নীলনদ থেকে ক্যাটফিশ ছাড়াও পার্চফিশ, বাগরিদ প্রভৃতি মাছের জোগান ছিল। মাছ ধরার উন্নত প্রযুক্তি হয়েছিল। যার ফলে মিশরীয়রা নীল নদীতে মাছ ধরতে দক্ষ হয়ে উঠেছিল।

## ● হস্তশিল্প :-

মিশরের নগরায়নের বিস্তারের সাথে সাথে যথেষ্ট পরিমাণে শিল্পের উন্নতি হয়েছিল। প্রথমদিকে বহু মানুষ স্ব ইচ্ছার পরিবর্তে ছুতোর, তাঁতি, কামার, কুমোরের প্রভৃতি কারিগরি কাজ করত, পরে তা বংশপরম্পরায় প্রসারিত হয়েছে, ফলে উৎপাদনে বৃদ্ধি পেয়েছে। ধীরে ধীরে কলকারখানাও গড়ে উঠেছে। মৃৎ শিল্প, ধাতু শিল্প, কাচ, বয়ন, সুতো, জাহাজ নির্মাণ শিল্প প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে বড়ো বড়ো কারখানা এই সময়ে মিশরে গড়ে ওঠে। এছাড়াও শন, পশম, চামড়া, হাতির দাঁত প্রভৃতি শিল্পেও তারা যুক্ত ছিল। শ্রমিকদের বেতন নগদে না দিয়ে খাদ্য দিয়ে পারিশ্রমিক দেওয়া হত। মিশরের রামেসেসের মন্দিরে সংরক্ষিত খাদ্য পারিশ্রমিক দেওয়া হত। নুবিয়ার স্বর্ণখনি থেকে তারা সোনা আমদানি করত। কোয়ার্টজাইট খুঁড়ে থেকে সোনা বার করা হত। অলংকারের পাথর যেমন- নীলা বৈদুর্য, গ্রেনাইট ও কারনেলিয়ান পূর্ব মরুভূমিতে প্রচুর পাওয়া যেত। ধাতু শিল্পে উন্নতির পাশাপাশি কাঠ, কাচ, সোনা, রুপো, টিন প্রভৃতি তারা ব্যবহার করত। মিশরীয়রা প্যাপিরাস শুধু লেখার উপকরণ হিসেবে নয়, মাদুর থেকে আসবাব- বহুবিধ সামগ্রী তৈরিতেও ব্যবহার করেছিল। শণ থেকে পাওয়া যায় তন্তু দিয়ে লিনেন তৈরি হত, যা সাধারণ মিশরীয়দের পরিচ্ছদ হিসেবে ব্যবহৃত হত।

খাদ্য প্রস্তুতকরণ এবং খাদ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাচীন রাজত্বের সমাজ তার পূর্ববর্তী যুগের অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। গমের রুটি ছিল প্রধান খাদ্যদ্রব্য। প্রাচীন রাজত্বে 12 রকমের রুটি ও কেক তৈরির কথা জানা যায়। আঙুর থেকে পানীয় তৈরি হত। মাংস সংরক্ষণের জন্য প্রচলিত পদ্ধতি ছিল শুকানো এবং লবণ দিয়ে জারানো।

## ● ব্যবসা বানিজ্য :-

কৃষি ও হস্তশিল্প ছাড়া প্রাচীন মিশরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অন্যতম উৎস ছিল বানিজ্য। অন্তঃ ও বহির্বানিজ্যে তাদের সাফল্য যথেষ্ট ছিল। বহির্বানিজ্য চলত মূলত তিনটি পথে- ভূমধ্যসাগরে-উত্তরে, নুবিয়া ও লোহিত সাগর থেকে দক্ষিণে এবং লোহিত সাগর থেকে পূর্বে। অন্তঃবানিজ্যে ব্যবহৃত হত নীলনদ। তাই নীলনদের তীরে বড়ো বড়ো বন্দর শহর গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন মিশরীয়রা সিরিয়া, ক্রীট, প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া ও প্যালেস্টাইনের সাথে ব্যবসা করত। তারা এইসব দেশ থেকে আমদানি করত সোনা, রুপো, হাতির দাঁত, অভ্র, মূল্যবান পাথর, কাঠ ও মশলা প্রভৃতি। অন্যদিকে রপ্তানি করত কার্পাস, লিনেন, শন, গম ও মৃৎপাত্র। মিশরীয়রা সিনাই থেকে তামা, নুবিয়া থেকে সোনা, এবং আরব থেকে মশলা আমদানি করত। মিশরীয় রাজাও ও অভিজাতরা খুবই বিলাসী ছিল তাই বিদেশ থেকে নানা বিলাসসামগ্রী আসত যার মধ্যে ছিল তেল, মনিমুক্তো। লেবানন থেকে আসত সিডার কাঠ, ও সিডার তেল আমদানি হত। লিবিয়া থেকে আসত অলিভ অয়েল যা জলপাইয়ের তেল।

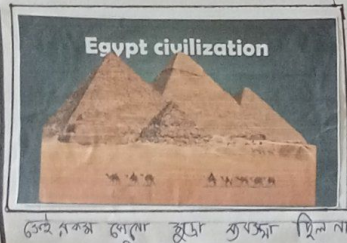




মিশরীয়দের রাজকীয় আয়ের উৎস ছিল ব্যবসাবানিজ্য। প্রতিটি শহর ও বন্দরের প্রবেশের পথে শুল্ক সংগ্রহের জন্য ঘাঁটি তৈরি করা হয়েছিল। রাজপরিবারের ব্যবহার্য বস্তুগুলো সবার উপরে শুল্ক আরোপিত ছিল। মিশরীয় বনিকদের ব্যবসায়িক জ্ঞান বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতা প্রশংসনীয় ছিল। বুককিপিং ও হিসাবরক্ষার ব্যাপারে তাদের দক্ষতা ছিল অদ্ভুতপূর্ব। সেই রকম কোনো মুদ্রা ব্যবস্থা ছিল না কিন্তু বড়ো বড়ো লেনদেনের ক্ষেত্রে তামা ও সোনার বস্তু ব্যবহার করত। তারা শক্তিশালী নৌবহর গড়েছিল। ব্যবসাবানিজ্য নিয়ে রাজা পুরোহিত দ্বন্দ্ব শুরু হয় যা মিশরীয় অর্থনীতির ভিত নড়িয়ে দেয়।


Govt. Gen. Degree College, Tehatta
Estd-2014
Govt. of West Bengal



HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT. GEN. DEG.COLLEGE. TEHATTA

# PROJECT

## বিষয় : ইতিহাস



আজটেক সভ্যতা

## SUBJECT :- HISTORY

## CC - 2

(1.) আজটেক সভ্যতার ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে আলোচনা করো ?

→ **ভূমিকা** :- আজটেক সভ্যতা দক্ষিণ আমেরিকার একটি প্রাচীন সভ্যতা। আজটেকেরা একদিকে ছিল যুদ্ধ প্রিয়; অন্যদিকে আবার ভীষণ অনু- -রক্ত ছিল ধর্মের প্রতি।

⊛ **আজটেকদের বাসস্থান** :- আজটেক কারা এবং কোথায় বসবাস করত। তা সঠিক ভাবে বলা না গেলেও বর্তমানে মেক্সিকো অঞ্চলে তারা বসবাস করত। বলে মনে করা হত।

⊛ **পুরোহিতদের ক্ষমতা এবং ক্ষমতাধারী দেবতা** :- আজটেক সমাজে সম্রাটদের চেয়েও ক্ষমতা বেশি ছিল মন্দিরের পুরোহিতদের। বিভিন্ন দেবতাদের মধ্যে সূর্য ও যুদ্ধের দেবতা হুইৎজিলকে মান্য করত। এর পরের ক্ষমতাধারী দেবতা ছিল বাতাসের নিয়ন্ত্রক দেবতা বিদ্যুৎ ও আগুনের দেবতা কোৎলি। এরা দেবতাদের সন্তুষ্টির জন্য নরবলী দিত। সমাজে প্রধান ধর্মীয় ছিল চারকোনা পিরামিড। তারা বিশ্বাস করত -দিন পুজো না করলে পরের দিন তাঁর আবার দেখা পাওয়া যাবেনা। ও তার অন্ধকারও কাটবে না। তাই তারা সূর্য দেবতাকে শান্ত রাখতে নর- -বলী দিত। বিশেষত যুদ্ধ বন্দিদেরই বলী দেওয়া হত বেশি।



আজটেক সূর্যকে প্রতি

আজটেক সভ্যতার বিভিন্ন চিত্র পত্র। (মেসোপটেমিয়া)

⊛ **আজটেকেরা কীরকম প্রকৃতির ছিল** :- আজটেকেরা ছিল তারা জীবন্ত মানুষের হৃৎপিণ্ড বের করে দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করত। নরবলীর পাশাপাশি বিভিন্ন ধনসম্পদ ও সোনা দানা ও উৎসর্গ করত। তারা দেবতাদের উদ্দেশ্যে নানা ধর্মীয় বাণী চিত্র কর্মের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলত। আজটেকরা বর্তমানে আমরা যে সূর্য দেখি তার আগে আরও চারটি সূর্য ছিল। সেগুলি মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই পঞ্চম সূর্যকে সন্তুষ্ট রাখতে না পারলে প্রতি যাবে। ফলে ধ্বংস হয়ে যাবে মর্তের প্রাণ। তাই তারা উঁচু স্থানে বলি কারণ তাহলে সূর্যের কিছুটা কাছাকাছি দেওয়া যায়। এই জন্য আজটেকেরা উঁচু পিরামিড নির্মাণ করত।



মানুষের তাজা বিশ্বাস করত বিশ্বগুলোর বিলীন হয়ে দিত। কারণ

NAME :- Sanchu Dawn.
CLASS ROLL :- 5

Registration Number is — 036563

Govt Gen Degree College Tehatta Estd-2014 Govt of West Bengal

HEAD DEPARTMENT OF HISTORY GOVT. GEN. DEG COLLEGE, TEHATTA

# প্রস্তর যুগের হাতিয়ারের বিবর্তন

মানব সভ্যতার ইতিহাস অগ্রগতির ইতিহাস। সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রকৃতির সাথে অহরহ সংগ্রাম করে আধুনিক মানুষের স্তরে উন্নীত হওয়ার ধারাবাহিক কাহিনি হল মানব সভ্যতার ইতিহাস। মানুষের এই যাত্রা পথ মোটেই মসৃণ ছিল না। নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে তাদের এই উত্তরণ। প্রকৃতির সাথে এই দীর্ঘ সংগ্রামে মানুষের প্রয়োজন হয়েছে নানা হাতিয়ারের। মানুষের আধুনিক মানুষের স্তরে উত্তরণের জন্যও প্রয়োজন ছিল বিভিন্ন হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির। মানুষের এই দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসের ভিত্তিতে মানব সভ্যতাকে দুটিভাগে ভাগ করা হয়েছে – প্রস্তর যুগ ও ধাতুর যুগ। সামগ্রীক ভাবে প্রস্তর যুগ প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্তর্গত। প্রস্তর যুগে মানব সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়টি ছিল শিকারজীবন। প্রস্তর যুগের উদ্ভব হয়েছিল কোয়াটারনারি যুগে প্লিস্টোসিন যুগে। J.D Bernal বলেছেন যে,–" হাতিয়ার জিনিসটা মূলত মানুষের অঙ্গেরই পরিবর্তিত রূপ। সম্পূর্ন নতুন আরেক ধরনের পরিবর্তন ঘটে যখন কোনও বস্তুকে মানুষের দেহ থেকে ছোঁড়া হয়। নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে তাক করে ছোঁড়া পাথরের নিদর্শন।" আমাদের আলোচ্য বিষয় হল প্রস্তরযুগের হাতিয়ারগুলির বিবর্তন। ব্যবহার্য অস্ত্র ও যন্ত্রের রূপও আকৃতিকে কেন্দ্র করে তারজন্য প্রস্তর যুগকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় —

যথা :— (i) প্রাচীন প্রস্তর যুগ বা প্যালিওলিথিক
(ii) মধ্য প্রস্তর যুগ বা মেসোলিথিক বা মাইক্রোলিথিক
(iii) নব্য প্রস্তর যুগ বা নিওলিথিক

■ নিম্নে প্রস্তর যুগের শ্রেণীবিভাগ গুলির সম্পর্কে আলোচনা করা হলো —

(i) প্রাচীনপ্রস্তর যুগ :— প্রাচীন প্রস্তর যুগের শুরু হয় অন্তত ৫০ বছর আগে এবং শেষ হয় প্রায় ১৫,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। পিকিং মানব, জাভা মানব, আটলানথ্রোপাস মানব (আলজেরিয়া), তাঙ্গুভাই মানব (তাঞ্জানিয়া), নিয়ানডারথাল মানব সহ বিভিন্ন শাখার হোমো ইরেক্টাস অর্থাৎ প্রায় মানুষেরা প্রাচীন প্রস্তর যুগের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

● প্রাচীনপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারের বৈশিষ্ট্য :–

এযুগের মানুষ বিভিন্ন ধরনের পাথর ও হাড়ের তৈরি হাতিয়ার ব্যবহার করত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করত। দক্ষিণ আফ্রিকার অস্ট্রালোপিথেকাস নামক মানব গোষ্ঠীর সর্বপ্রথম পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করতে শুরু করে। এই যুগের মানুষ প্রকৃতি থেকে যে আকারের পাথর পেত, কোন আকারগত পরিবর্তন না করে সেটিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাথর ভেঙে ধারালো ও তীক্ষ করার চেষ্টা করত বলেও মনে করা হয়। তারা এরূপ হাতিয়ার দিয়ে মাংস কাটা, কাঠ কাটা, শিকার করা প্রভৃতি বিভিন্ন কাজ করত। প্রথম দিকে এই সাধারণ হাতিয়ার 'হাতকুঠার' নামে পরিচিত ছিল। ক্রমে তারা পাথরের বল্লম, ছুরি, ছুঁচ, হারপুন প্রভৃতি হাতিয়ার তৈরি করতে শুরু করে। এ যুগের শেষ দিকে মানুষ তীর–ধনুক আবিষ্কার করে।

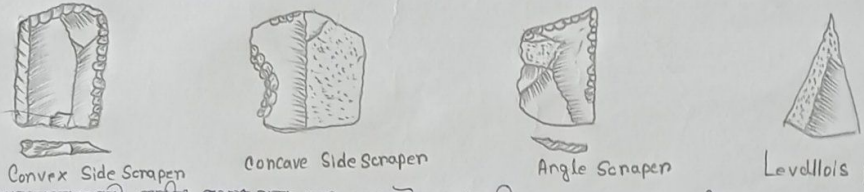

■ হাতিয়ারের চিত্র —




(ii) মধ্য প্রস্তর যুগ :– খাদ্য সংগ্রহকারী প্রাচীন প্রস্তর যুগ এবং খাদ্য-উৎপাদনকারী নব্য প্রস্তর যুগের মধ্যবর্তী সময়কাল মধ্যপ্রস্তর যুগ নামে চিহ্নিত হয়। এ যুগের সময়সীমা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরকম। তবে সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, খ্রিস্টপূর্ব ১৫,০০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১০,০০০ অব্দ পর্যন্ত মধ্যপ্রস্তর যুগ বিস্তৃত ছিল।

● মধ্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারের বৈশিষ্ট্য :–

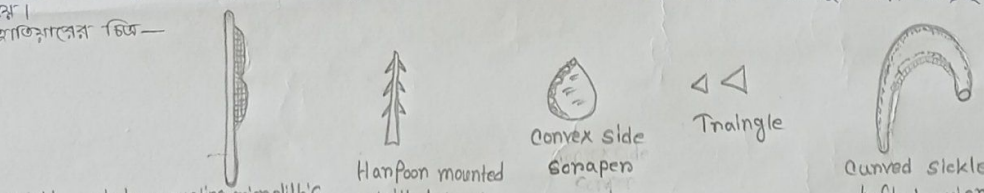

এযুগের মানুষ হাতিয়ার তৈরিতে আরও দক্ষতার পরিচয় দেয়। এ যুগের হাতিয়ার গুলো পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে উন্নত ও আকারে ক্ষুদ্র হয়। এই সময়কালের মানুষেরা ২-৫ সেমি. মাপের ছোটো ছোটো হাতিয়ার বা পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করত। হাতিয়ারের ক্ষুদ্র আকারের জন্য এই যুগকে ক্ষুদ্র প্রস্তর যুগ বা মাইক্রোলিথিক যুগ নামেও অভিহিত করা হয়। পাথর ছাড়াও জীবজন্তুর হাড়, দাঁত প্রভৃতি দিয়ে হাতিয়ার তৈরি এসময় আরও উন্নত হয়।

■ হাতিয়ারের চিত্র —




(iii) নব্য প্রস্তর যুগ :– মধ্যপ্রস্তর যুগের পরবর্তী নব্যপ্রস্তর যুগের কালসীমা হল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১০,০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬,০০০ অব্দ। তবে ভারতে এ যুগের সূচনা হয় কেবিতে ; ৬,০০০ খ্রিস্টপূর্ব। + বালুচিস্তানের মেহেরগড়ে ৬,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বা তার কিছু আগে নব্য প্রস্তর যুগের সূচনা হয় বলে ঐতিহাসিক D.P Aggarwal অভিমত দিয়েছেন।

● নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ারের বৈশিষ্ট্য :–

এ যুগের হাতিয়ারগুলিতে ধারাবাহিক বিবর্তনের ছাপ সুস্পষ্ট। এ যুগের হাতিয়ারগুলি এসময়ে যথেষ্ট তীক্ষ্ণ, মসৃণ ও উন্নত হয়ে ওঠে। এ ছাড়া কুলো, হামানদিস্তা, শিলনোড়া, জাঁতা, হাতুড়ি, বাটালি, নেহাই প্রভৃতি যন্ত্রপাতির উদ্ভব এ যুগেই হয়। এ যুগে প্রাচীনপ্রস্তর যুগের হাতকুঠারের অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। এ সময়ে কুঠারের সামনের দিকটি অনেক বেশি তীক্ষ্ণ ও কাঠের হাতলযুক্ত হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকাজ ও পশুশিকারের জন্য উন্নত হাতিয়ারের প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পায়।

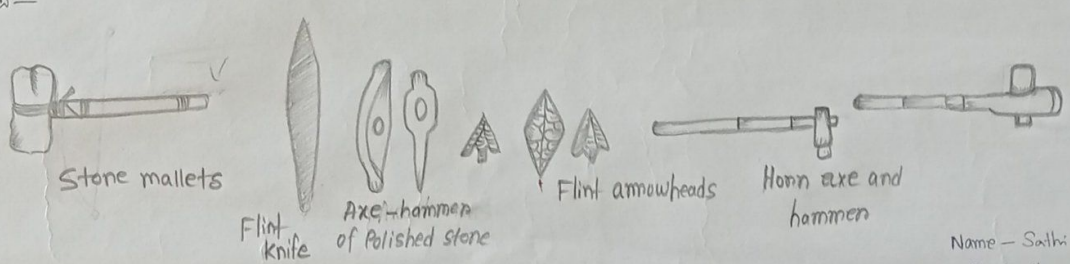

■ হাতিয়ারের চিত্র —




Name – Sathi Mallick
Roll – 11
History Honours 1st sem
REG N NO: 036564

Govt Gen Degree College, Tehatta · Estd-2014 · Govt of West Bengal
HEAD DEPARTMENT OF HISTORY GOVT GEN DEG COLLEGE, TEHATTA

# মধ্য প্রস্তর যুগ [Mesolithic]

Name - Aditi Haldar
Roll - 14
History 1st sem.
REG.N NO - 036551

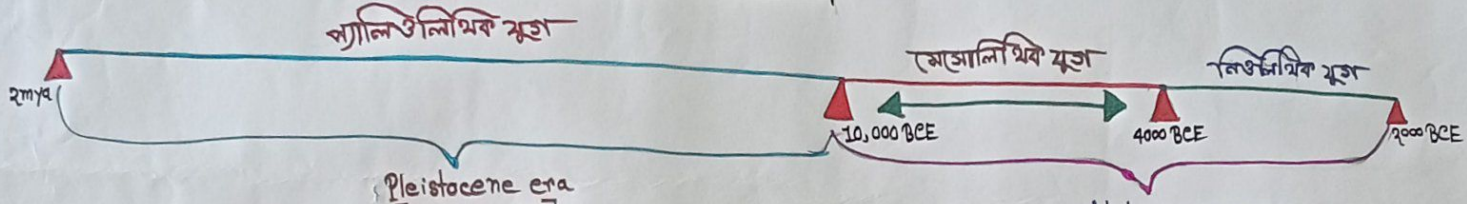




**ভূমিকা :—** মধ্য প্রস্তর যুগ বা মেসোলিথিক হল প্রাচীন প্রস্তর যুগ বা প্যালিওলিথিক এবং নব্য প্রস্তর যুগ বা নিওলিথিক - এর মধ্যবর্তী এক যুগ। পৃথিবীর ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্য প্রস্তর যুগের সময়কাল আনুমানিক ১৩ হাজার থেকে ১০ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। মধ্য প্রস্তর যুগের বৈশিষ্ট্য -(i) মানুষ এখনও শিকারী ও খাদ্য সংগ্রাহক (ii) অস্ত্র তৈরি করে পাথর দিয়ে যা আকারে আগের থেকে ছোটো কিন্তু অনেক বেশি ধারালো (iii) দলবদ্ধভাবে বাস করে কিন্তু স্থায়ীভাবে একস্থানে বসবাস করে না এবং (iv) আগুনকে নিয়ন্ত্রন করে ব্যবহার করতে পারে।

**খাদ্য :—** মধ্য প্রস্তর যুগে মানুষের খাদ্যতালিকায় প্রধান স্থান দখল করেছিল মাছ ও মাংস। মাছ শিকারে তারা বেশ গুরুত্ব দিতে শুরু করেছিল এইসময়ে, তাই সমুদ্র উপকূল, নদীর মোহনা, হ্রদ, জলাশয় থেকে তারা মাছ শিকার করে খেত। এমনকি শামুক সংগ্রহ করত পরবর্তী সময়ের খাবার জন্য। বেত, বাঁশ দিয়ে তারা ভেলা, বাঁধ, কাঠের পানসি, গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি ক্যানো ও ভেলা প্রভৃতির সাহায্যে মাছ শিকার করে বেড়াত। মাছ ধরার জন্য তাদের ছিল বঁড়শি, জাল, ফাঁদ, বর্শা ও ত্রিশূল প্রভৃতি। প্রিয় মাছ ছিল স্যামন, শিল, ট্রাউট প্রভৃতি। উড়ন্ত পাখির শিকারের জন্য তারা পালক বিশিষ্ট তির ব্যবহার করত। ইউরোপ, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মানুষেরা এই যুগে নানা রকমের ফল মূল খেত।

**পশুপালন :—** মধ্য প্রস্তর যুগের মানুষেরা পশুপালনে যথেষ্ট মনোযোগী হয়ে পড়ে। কুকুর সম্ভবত সবথেকে প্রথম গৃহপালিত প্রাণী। খাবারের খোঁজে তারা লোকালয়ে এসে আশ্রয় নেয়। মানুষ তাদের খাবার দিত বিনিময়ে কুকুর তাদের আস্তানার নিরাপত্তার দেখভাল করত। বরফের উপর দিয়ে চলবার জন্য তারা কুকুরে টানা স্লেজগাড়ি ব্যবহার করত।

## মেসোলিথিক পাথরের সরঞ্জাম

লোকেরা খুব ছোটো সরঞ্জাম তৈরি এবং ব্যবহার করতে শুরু করেছিল যাকে মাইক্রোলিথ বলা হয়

Microliths দৈর্ঘ্য পরিসীমা → (1 সেমি থেকে 5 সেন্টিমিটারের নিচে)

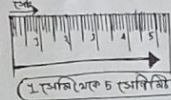

**গুহাচিত্র :—** গুহাচিত্র মধ্য প্রস্তর যুগের মানুষ গুহা চিত্র অঙ্কনের বিশেষভাবে পারদর্শী ছিল। তাদের অঙ্কিত গুহাচিত্র গুলি ছিল জ্যামিতিক আকারে, যেমন - ত্রিকোনাকার, চতুষ্কোন বা বৃত্তাকার। এদের ছবির বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন ধরনের শিকার। যেমন:- হরিণ শিকার, মাছশিকার প্রভৃতি।






### সমাধি

মধ্য প্রস্তর যুগে মৃতদেহকে সমাধিস্থ করা হত। তবে, এই যুগের যে সমস্ত সমাধিগুলো পাওয়া গেছে, সেগুলোতে মূলত বিকৃত মাথার খুলি পাওয়া গেছে। তাতে মনে হয় নির্মমভাবে মেরে তাদের সমাধিস্থ করা হয়েছে।

Burial Practices



### Crypto - Crystalline Silica stone

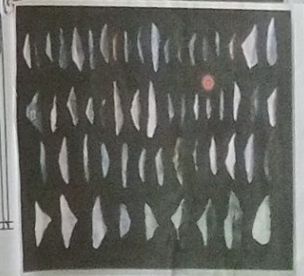








: Blade, Core, Point, Triangle, Lunate, Trapeze

Govt. Gen. Degree College, Tehatta · Estd-2014 · Govt. of West Bengal
HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT. GEN. DEG. COLLEGE TEHATTA

# ইনকা সভ্যতা

Name- Prithwi Mandal
Roll- 4
Class- 1st Sem
Sub- History
Registration No- 036558

নতুন বিশ্বের অন্যতম আরেক উল্লেখযোগ্য সভ্যতা ইনকা সভ্যতা। দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতমালার দক্ষিণে পেরুর কুজকো অঞ্চলকে কেন্দ্র করে এই সভ্যতার সূচনা হয়। দ্বাদশ শতক থেকে ইনকারা তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে শুরু করেছিল। তবে এরা ষোড়শ শতকে বিস্তৃতির চরম শিখরে ওঠে। ইকুয়েডর থেকে উত্তর চিলি পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করেছিল। 'ইনকা' শব্দের অর্থ 'পবিত্র'। তারা নিজেদের সূর্যদেবতার প্রতিনিধি বলে মনে করত। প্রথম দিকে তারা প্রতিনিধি দিয়ে শাসন করত, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা সরাসরি শাসন ক্ষমতার দখল করে একটি রাজনৈতিক শাসন কাঠামো গড়ে তোলে। তাদের সুদক্ষ শাসন ও সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রবণতার কারণে ১৫৩২ সালে স্পেনীয় আক্রমণের আগে তাদের সাম্রাজ্য আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। ফ্রান্সিসকো পিজারোর নেতৃত্বাধীন বাহিনীর আক্রমণে ইনকা সভ্যতা অবলুপ্ত হয়। পতনের পরও পেরু, ইকুয়েডর, চিলি, বলিভিয়া ও আর্জেন্টিনাতে ইনকাদের পরবর্তী প্রজন্মকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখা যায়।

ইনকাদের বাসভূমিকে 'তাওয়ানতিনসুয়ু' বলা হত, যার অর্থ চার অংশ। ইনকা সভ্যতার চারটি অংশ হল — আন্তিসুয়ু, চিনচাসুয়ু, কুনতিসুয়ু ও কোলাসুয়ু। এদের রাষ্ট্রীয় ভাষা 'কেচুয়া'। যদিও সাম্রাজ্য জুড়ে প্রায় 20টি ভাষার চল ছিল। ইনকা সভ্যতার ভৌগোলিক পরিবেশ ও বৈচিত্র্যময় পাহাড়, উর্বর সমতল ভূমি, সমুদ্রউপকূল, বনভূমি সবই ছিল। উত্তর থেকে দক্ষিণে 2500 মাইল প্রসারিত আন্দিজ পর্বতমালার কলম্বিয়া থেকে চিলি হয়ে পূর্বদিকে আর্জেন্টিনা বনভূমি থেকে আমাজনের বনাঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত ছিল ইনকাদের সভ্যতা। ইনকা সভ্যতায় দুটি আলাদা সাম্রাজ্যের হদিস পাওয়া যায় — প্রথমটি হল টিটিকাকা হ্রদের কাছে টিওয়ানাকু (৩০০–১১০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) ও অন্যটি আয়াকুচো শহরের নিকট অবস্থিত ওয়ারি সভ্যতা। কুজকোদের অধীনে অর্থাৎ প্রায় 400 বছর টিকে ছিল।

## রাজনৈতিক ইতিহাস :

ইনকাদের রাজনৈতিক ইতিহাস যে খুব বিশদ জানা গেছে তেমন নয়। স্পেনীয়দের কিছু লেখা থেকে তাদের সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। ১২০০ খ্রিস্টাব্দে নাগাদ ইনকারা কুজকোতে শহর গড়ে তোলেন। মনে করা হয় যে ইনকা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা মানকো কাপাক। ইনকাদের সম্পর্কে যেটুকু জানা যায় তাতে মনে করা হয় কসকো অঞ্চলের মূলত চার ভাই বোন থাকত। তাদেরই একজন আয়ার মানকো ছলে বলে কৌশলে ও নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে মানকো কাপাক নাম নিয়ে রাজা হয়ে বসেন। তিনি ইনকাদের স্রষ্টা বলে মনে করা হয়। এই কসকো অঞ্চলে বাড়ি নির্মাণ করে তিনি বসতি স্থাপন করেন। তার পর তার ছেলে সিঞ্চি রোকা শাসক হন। ইনকাদের। ইনকাদের তেরোজন রাজার কথা জানা যায়, যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে পাচাকুটিকে মনে করা হয়। তিনি ১৪৩৮ থেকে ১৪৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন। স্পেনীয় ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে মনে করা হয়, ইনকা সাম্রাজ্যের তিনভাগের দুই ভাগই তিনি দখল করেছিলেন। সাম্রাজ্য বিস্তারকে সহজে করার জন্য তিনি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতেও বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। ১৪৭০ সালে তিনি এই অঞ্চলের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল চিমু বা বর্তমান পেরু অধিকার করেন। ইনকারাষ্ট্র ব্যবস্থাটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয়। এর চারটি অংশে শাসন করতেন চারজন প্রাদেশিক বা স্থানীয় শাসনকর্তা। সবার উপরে ছিলেন রাজা। চারটি প্রদেশ মিলিত হয়েই কুজকো গঠিত হয়েছিল। প্রাদেশিক বিষয়গুলো যেমন — সেখানকার আর্থিক, সামরিক, বিচারীয় ও ছোটখাটো স্থানীয় শাসনকেন্দ্রিক সমস্যা প্রভৃতি দেখতেন স্থানীয় শাসনকেরা। তাদের শাসনের তিনটি ভিত্তি হল — আমাসুয়া বা চুরি না করা, আমা ল্লুল্লা বা মিথ্যে না বলা ও আমা কুইল্লা বা অলস না হওয়া।

## অর্থনীতি :

ইনকা সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল কৃষি ও পশুপালন। ব্যবসা বাণিজ্যেরও কিছুটা প্রচলন ছিল তাদের মধ্যে। তাদের অর্থনীতি দাসব্যবস্থা, সামন্ততন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের একটি মিশ্রিত রূপ দেখা যায়।

কৃষি : ইনকারা সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করত। পাথুরে জমিকে চাষযোগ্য করা ও জলসেচ ব্যবস্থা করে কৃষির উৎপাদন বাড়াতে জানত। উচ্চভূমি, উপত্যকায় বিশেষ করে উচ্চঢালুতায় ধাপ চাষে তারা দক্ষ ছিল। বৃষ্টির জলকে কাজে লাগিয়ে চাষ করতে যেমন তারা জানত আবার খরার সময় খাল কেটেও তারা জলের ব্যবস্থা করতেও সক্ষম ছিল। জমির উর্বরতা বাড়াতে তারা নাইট্রেট জাতীয় পদার্থ ব্যবহার করা হত। তাদের প্রধান ফসল ছিল [illegible], আলু। এছাড়া তারা চাষ করত বিন, লঙ্কা, মটর, তুলো প্রভৃতি।

## পশুপালন :

ইনকারা পশুপালনেও যথেষ্ট দক্ষ ছিল। উট জাতীয় প্রাণী এরা প্রতিপালন করত। এই প্রাণীগুলোকে তারা লামা ও আলপাকা বলত। লামারাই ছিল তাদের প্রধান ভারবাহী প্রাণী। তারা মাছ চাষও করত।

## ব্যবসাবাণিজ্য :



ইনকাদের মন্দির

স্থল ও জলপথে তারা বাণিজ্য করত। তাদের মধ্যে বিনিময় প্রথা ছিল। তাদের ব্যবসার প্রধান পণ্য ছিল খাদ্যদ্রব্য, রং, অলংকার ও বস্ত্র প্রভৃতি। ব্যবসার সাথে যুক্ত মানুষদের তারা মিন্ডালাই বলত। তারা সরকারকে যে কর দিত তাকে মিট আ বলত। সরকারকে কর দিত বলে সরকার তাদের রক্ষা করত, খাদ্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করত। কর সংগ্রাহকদের কুরাকা ও কামায়ক বলা হত।

## সমাজ :

ইনকা সমাজে সবার উপরে স্থান ছিল রাজার। রাজাকে সাহায্য করত পুরোহিত ও অভিজাতরা। সমাজ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। গোত্রের নেতৃত্বে ছিলেন গোত্র প্রধান।

## ধর্ম :

ইনকাদের বিশ্বাস ছিল সমস্ত দেবতাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন বীরাকোচা বা সূর্যদেবতা। তারা মনে করত ইনকা সম্রাটেরা সূর্যদেবতার বংশধর। তারা মনে করত সোনা হচ্ছে সূর্যদেবতার প্রতীক। তাই তারা সোনা ব্যবহার করতনা। তাদের ধর্ম মন্দির গুলো ধাঁধাচিত্রি ছিল। কুজকোর সূর্যমন্দিরটি ছিল তাদের প্রশাসনিক কেন্দ্র। ইনকাবাসীরা মৃতদের দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি দিত। রাজার দৈবত্ব মতবাদে এরা বিশ্বাস করত। ইনকারা মানুষেরা মৃত্যুর পর আর একটা জীবন আছে বলে মনে করত। সেখানে পাপীরা শাস্তি পেত ও পুণ্যবানেরা সুখশান্তি করত বলে তারা মনে করত। তাদের মধ্যে মমি রাখার চল ছিল বলে মনে করা হয়।

ইনকাদের অন্যান্য দেবতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন — পর্বতের দেবতা আপো, বিদ্যুতের দেবতা কাতেকিল, তারার দেবী চাসকা, স্বাস্থ্য ও আনন্দের দেবী মামাকোচা; হ্রদের দেবী কোপাকাতি, মৃতদের দেবতা একেকো, আবহাওয়ার দেবতা ইল্লাপা, বৃষ্টি ও বাতাসের দেবতা কোন, উর্বরতার দেবতা মামা আল্লপা, বিবাহের ও চন্দ্র দেবী মামা কিল্লা, মৃত্যুর দেবতা মাচা গুয়া ও মৃত্যুর দেবতা। সুপাই। প্রভৃতি

## স্থাপত্য ও শিল্প :



ইনকা সমাজের রাজা

পাথর দিয়ে তৈরি তাদের স্থাপত্যগুলো ছিল অনবদ্য। তাদের নগরপরিকল্পনাও ছিল খুব সুন্দর। কুজকোর কাছে 'সাকসাইওয়ামান' দুর্গটি ছিল বিশাল পাথরখণ্ড দিয়ে তৈরি। তারা শস্য সংরক্ষণের জন্য গোলাঘরও বানিয়েছিল। উঁচুতে বানানো গোলাঘর গুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো বাতাস খেলাত। দক্ষিণ-মধ্য পেরুর মাচুপিচু ছিল বিশ্বের এক ঐতিহ্যমণ্ডিত অঞ্চল। ১৯১১ সালে আমেরিকার অভিযাত্রী হিরাম বিংহাম এটি আবিষ্কার করেছিলেন। সেখানকার মন্দির, প্রাসাদ সবই ছিল অপূর্ব। মাচুপিচুতে স্নানাগার, শিল্পাঞ্চল ও সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি পাওয়া গেছে। মৃৎশিল্পে তারা বিশেষ দক্ষ ছিল। যুদ্ধের জন্য তারা ব্রোঞ্জ, কাঠ, তামা, প্রাণীর চামড়া, হাড়, পাথর দিয়ে বিভিন্ন অস্ত্র তৈরি করত। বস্ত্রশিল্পেও তারা দক্ষ ছিল।

## সড়ক :

বিশাল সাম্রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সেখানকার সম্রাটেরা রাস্তার উন্নতিতে বিশেষ মন দিয়েছিলেন। ইনকাতে মোট 20,000 কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হয়েছিল। রাস্তা ছাড়াও নদী বা খাদের ওপর তারা সেতু নির্মাণও করেছিলেন। সেতুগুলোর অনেকগুলোই ছিল ঝুলন্ত সেতু। নদী পথে যাতায়াত এর জন্য তারা ভেলা, পালতোলা নৌকা ও ডিঙি নৌকা ব্যবহার করত।

## লিখন পদ্ধতি :

ইনকাবাসীরা হিসাব না জানলেও হিসাব রাখার জন্য একটি পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল যাকে বলা হত 'কুইপু'। এই পদ্ধতিতে তারা লম্বা ঘাস বা দড়ির মধ্যে গিঁট দিতে [illegible] রাখত। এদের সংখ্যার ভিত্তি ছিল দশ।

জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে ক্যালেন্ডার নির্মাণ পরিমাপ বিষয়ক সুস্পষ্ট ধারণা, গণিতের জ্ঞান ইনকাবাসীদের বিশেষত্ব। তার উপর চিকিৎসা বিজ্ঞানেও তাদের [illegible] দক্ষতা অদ্ভুত পূর্ব। তারা মানুষের মাথায় খুলির সুনিপুণভাবে অস্ত্রোপচার করেছিল। সর্বোপরি কোকা গাছকে অসাড় ভাবে ব্যবহার করে [illegible] তারা চিকিৎসায় সুফল পেয়েছিল। তাই সবশেষে বলা যায়, ইনকা সভ্যতা বিশ্ব ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তারা স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের সভ্যতা গড়ে তোলে দীর্ঘদিন টিকিয়ে রেখেছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থানে। যদিও শেষ পর্যন্ত স্পেনীয় আক্রমণকারীদের হাতে তাদের পতন ঘটে ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে।

Govt. Gen. Degree College, Tehatta
Estd-2014
Govt of West Bengal

HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT GEN DEG COLLEGE TEHATTA

Name — Rubina Khatun
1st sem, History honours, CC2
Reg No. 036562

# প্রাচীন প্রস্তর যুগ বা Palaeolithic Age

গ্রিকভাষায় Palaious অর্থ প্রাচীন ও Lithos মানে উপল বা পাথর। সেই অর্থে "Palaeolithic Age" কথাটির সরল অনুবাদ করলে দাঁড়ায় প্রাচীন প্রস্তর যুগ। এই যুগেও মানুষ সাধারণভাবে অমার্জিত স্থূল, অমসৃণ পাথরের হাতিয়ার ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করেছিলেন। Richard Leakey বলেছেন যে, মানব সভ্যতার ইতিহাসে হোমো হাবিলিসের আবির্ভাবের আগে হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি নির্মাণ ধারাবাহিকভাবে শুরু হয়। কারণ, এই ধরনের যন্ত্রপাতি নির্মাণ বড়ো মস্তিষ্কের মানুষের পক্ষেই সম্ভব ছিল বলে তিনি মনে করতেন। হোমো হাবিলিসরা বড়ো মস্তিষ্কের মানুষ হওয়ায় তারা যন্ত্রপাতি হাতিয়ার নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ভারতের প্রাচীন বা পুরা-প্রস্তর যুগের সময়কাল আনুমানিক ২০ লক্ষ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১০ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ। হাতিয়ারের ধরন, গঠন, বৈশিষ্ট্য ও বিবর্তনের ভিত্তিতে প্রাচীন বা পুরা-প্রস্তর যুগকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা —
① নিম্ন প্রাচীন প্রস্তর বা আদি পুরা-প্রস্তর ② মধ্য প্রাচীন প্রস্তর বা পুরা-প্রস্তর উপপর্ব ③ উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর বা অন্তিম পুরা-প্রস্তর উপপর্ব।

## ① নিম্ন প্রাচীন প্রস্তর :—

নিম্ন প্রাচীন প্রস্তর যুগের সময়কাল ৫০ হাজার থেকে ১৫ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। ভারতের নিম্ন পুরা-প্রস্তর উপপর্বের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কার হয়েছে পাঞ্জাবের সোয়ান অঞ্চলে ও কাশ্মীর প্রদেশের পহেলগাঁও-এর কাছে। ভারতের নিম্নপুরাপ্রস্তর পর্বের উপপর্বের চারটি বসতি বা কেন্দ্রের নাম পাঞ্জাবের জালালপুর, গুজরাটের হিরান উপত্যকা, মধ্যপ্রদেশের ভীমবেটকা ও তামিলনাড়ুর অত্তিরম্পক্কমে নিম্ন পুরা-প্রস্তর উপপর্বের বসতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

### বৈশিষ্ট্য :—

① আদি পুরাপ্রস্তর উপপর্বের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেছে পূর্ব আফ্রিকার ওল্ডুভাই এলাকা থেকে। এই সময় মানুষ অতি অনুন্নত নুড়ি-পাথর জাতীয় অস্ত্রের সাহায্যে খরগোশ, সজারু জাতীয় ছোটো ছোটো প্রাণী শিকার করত। ফল সংগ্রহকারী মানবগোষ্ঠী এইভাবে শিকারী ও মাংসাহারী হয়েছিল।
② নিম্ন প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের জীবযাত্রা ছিল পশুশিকার ও পশু মাংস সংগ্রহ করত, এরা দলবদ্ধভাবে বসবাস করত। রুক্ষ পাথরের হাতিয়ার হাতকুঠার ব্যবহার করা হতো। টুকরো পাথরের হাতিয়ারগুলি ছিল তীক্ষ্ণাগ্র এবং ছুরি জাতীয়। এছাড়া তারা পাথরের বল্লম, ছুঁচ, হারপুন, বাঁকা প্রভৃতি ব্যবহৃত হতো।





## ② মধ্য প্রাচীন প্রস্তর :—

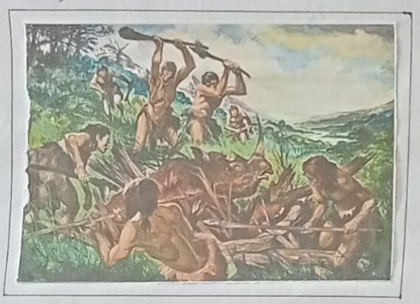

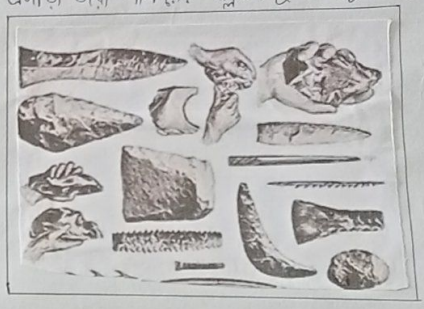

মধ্য পুরা-প্রস্তর উপপর্বের সময়কাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১ লক্ষ থেকে ৪০ হাজার অব্দ। মধ্য পুরাপ্রস্তর উপপর্বের চারটি বসতি বা কেন্দ্রের নাম হল রাজস্থানের দিদওয়ানা, উত্তরপ্রদেশের কালপি, মহারাষ্ট্রের নেভাসা ও অন্ধ্রপ্রদেশের নল্লিপল্লিতে মধ্য পুরা-প্রস্তর উপপর্বের বসতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

### বৈশিষ্ট্য :—

① মধ্য পুরা-প্রস্তর সংস্কৃতির হাতিয়ারগুলি অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের ও তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র। যার মধ্যে অন্যতম ছিল কুড়ুলাকার ছুরি, বর্শা প্রভৃতি। জটিল যন্ত্রপাতি নির্মাণ করতে তারা শিখেছিল। তারা চোকলা কে কাঠের দণ্ডের সাথে যুক্ত করে বর্শা বানিয়েছিল। এছাড়াও এই সময়ে বানানো হয়েছিল পাথরের ঘুরণি, পাথরের ছুঁচ, চাঁছবার যন্ত্র, চকমকি পাথর বসানো লাঠির বর্শা প্রভৃতি।
② মধ্য পুরাপ্রস্তর যুগে মুস্তেরিয়ান সংস্কৃতি মৃতদেহগুলো সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা ছিল। মৃতদেহের সাথে কিছু হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি দেওয়ার প্রচলন শুরু হয়। মধ্য প্রাচীন প্রস্তর যুগে। নিয়ানডারথাল মানুষ মৃতদেহ সৎকার করতে অভ্যস্ত ছিল। মুস্তেরিয়ান কবরের বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে ইউরোপ ও ইরাকের জাগ্রোস পর্বতের কাছে শানিদার গুহায়।





## ③ উচ্চ-প্রাচীন প্রস্তর :—

ভারতে উচ্চপ্রাচীন প্রস্তর উপপর্বের সময়কাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪০ হাজার থেকে ১০ হাজার অব্দ। উচ্চ বা অন্তিম পুরা প্রস্তর উপপর্বের চারটি বসতি বা কেন্দ্রের নাম হল — উত্তরপ্রদেশের চোপানি মান্ডো, মধ্যপ্রদেশের বাঘোর এবং অন্ধ্রপ্রদেশের বেতমচেরলা/জেডিকাল্লু ও চিন্তামানু গাভিতে উচ্চ পুরা-প্রস্তর উপপর্বের বসতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

বৈশিষ্ট্য :— ① উচ্চ বা অন্তিম পুরা প্রস্তর সংস্কৃতির হাতিয়ার ছিল, কাঠের দণ্ডে লাগানো বর্শা ও বল্লম জাতীয় অস্ত্র। পাথরের ফলককে দুই দিক দিয়ে ধারালো করে বানানো হত এই সংস্কৃতির হাতিয়ার। এছাড়াও 'কম্পোজিট টুলের' হাতিয়ার পাওয়া যায়। এই সংস্কৃতিতে হাড়ও পশুর দাঁতের অলংকারের মাধ্যমে ...

Govt. Gen. Degree College, Tehatta * Govt of West Bengal * Estd-2014

HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT. GEN. DEG. COLLEGE, TEHATTA

CC-2

# নব্য প্রস্তর যুগের বৈশিষ্ট্য

পাথরের তৈরি হাতিয়ারের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করে বিভিন্ন প্রত্নতত্ত্ববিদগন প্রস্তর যুগকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন যথা — ১) প্রাচীন প্রস্তর যুগ ২) মধ্য প্রস্তর যুগ ও ৩) নব্য প্রস্তর যুগ। নব্য প্রস্তর যুগের শেষে মানুষ ধাতুর ব্যবহার শুরু করে। তারা সর্বপ্রথম তামা এবং এর কিছুকাল পর ব্রোঞ্জধাতুর ব্যবহার শেখে। তাই নব্য প্রস্তর যুগের পরবর্তী সময় কাল হল তাম্রপ্রস্তর যুগ। মধ্য প্রস্তর যুগের পরবর্তী পর্যায়ে নব্য প্রস্তর যুগের আবির্ভাব হয়েছিল। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০,০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৮০০০ অব্দে দক্ষিন এশিয়ায় এই যুগের সূচনা হয়েছিল। তবে ভারতে এ যুগের সূচনা হয় দেরিতে ৬০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

□ নব্য প্রস্তর যুগের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য গুলি হল :—

**হাতিয়ার ও তার বৈপ্লবিক অগ্রগতি:** এই যুগের হাতিয়ারগুলিতে ধারাবাহিক বিবর্তনের ছাপ সুস্পষ্ট। হাতিয়ার গুলিতে ধারাবাহিক বিবর্তনের ছাপ স্পষ্ট। হাতিয়ার গুলি এসময় যথেষ্ট তীক্ষ্ণ, মসৃন ও উন্নত হয়ে ওঠে। এ যুগে মাটি খুঁড়ে বীজ বপন করার জন্য নতুন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ঘটে। এবং ফসল কাটার জন্য তৈরি হয় কাস্তে। এছাড়া হামানদিস্তা, শিলনোড়া, হাতুড়ি, বাটালি প্রভৃতি তৈরি হয় এযুগে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকাজ এবং পশু শিকারের জন্য উন্নত হাতিয়ারের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়।

**কৃষির সূচনা:**
নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ কৃষিকাজের কৌশল আবিষ্কার করে এবং স্থায়ীভাবে এক জায়গায় বসবাস শুরু করে, ফলে খাদ্য সংগ্রহকারী থেকে মানুষ এই যুগে খাদ্য উৎপাদনকারীতে পরিনত হয়। কিন্তু নব্য প্রস্তর যুগে কৃষি আবিষ্কারের ফলে মানুষের সেই অনিশ্চয়তা দূর হয়। সুতরাং নব্য প্রস্তর যুগের উল্লেখযোগ্য দিক হলো কৃষির আবিষ্কার। এর ফলে মানুষের যাযাবর বৃত্তির অবসান ঘটে। ভারতীয় উপমহাদেশের বালুচিস্তানের মেহেরগড়ের মানুষ প্রথম কৃষিকাজ শুরু করেছিল। কৃষিজ ফসলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল যব, গম, ভুট্টা, খেজুর ইত্যাদি।

**পশুপালন:**
নব্য প্রস্তর যুগের মানুষেরা কৃষির প্রয়োজনে পশুপালন করতে শুরু করে। পশুকে কৃষিজমিতে কাজে লাগিয়ে কৃষি উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। পরিবহনের কাজেও পোষ মানানো পশুকে কাজে লাগানো শুরু হয়। এই সময় দক্ষিন এশিয়ায় হাতি ও মহিষকে এবং জর্ডনে কুকুর ও ছাগলকে প্রতিপালন করা শুরু হয়। মনে করা হয় মানুষ সর্বপ্রথম কুকুরকে পোষ মানিয়েছিল। তারপর গরু, মোষ, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি পুষতে থাকে।

**স্থায়ী বসতি নির্মান:**
নব্য প্রস্তর যুগে কৃষির আবিষ্কারের ফলে মানুষ নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে, এই সময় বন্য পশুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয় মানুষের অনেকটা কমে যায়। তারা এ যুগের শেষের দিকে কুটির বা গৃহনির্মান করতে শুরু করে। কুটির তৈরির জন্য তারা গাছের ডালপালা, লতাপাতা, ঘাস ব্যবহার করত। এই বসতি অঞ্চল ক্রমে গ্রামে পরিনত হয়।

**চাকার ব্যবহার ও অন্যান্য অগ্রগতি:**

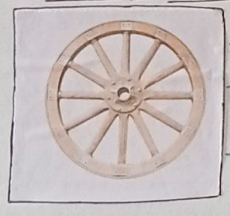



কৃষির আবিষ্কারের ফলে নব্য প্রস্তর যুগে মানুষ পর্যাপ্ত খাদ্য সংস্থান করতে সক্ষম হলে তাদের খাদ্যের জন্য আর বিশেষ চিন্তা করতে হতো না। এই সময় মানুষ আগুনের নানাবিধ ব্যবহার, চাকার আবিষ্কার, মৃৎশিল্প, যানবাহন তৈরি, গৃহ নির্মান প্রভৃতি করতে শেখে। এই যুগের শেষের দিকে মানুষ ধাতুর ব্যবহার করতে শেখে। এক্ষেত্রে অন্যান্য যুগের তুলনায় নব্য প্রস্তর যুগের অগ্রগতি ও প্রাপ্তি ছিল অনেক বেশি। নব্য প্রস্তর যুগের এই অভাবনীয় অগ্রগতি লক্ষ্য করে গবেষক গর্ডন চাইল্ড একে "নব্য প্রস্তর যুগের বিপ্লব" বলে অভিহিত করেছেন।

**ধর্মবিশ্বাস:** প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনা এসময় মানুষের মনে ভয়ের উদ্রেক করে। এই ভয় থেকে জন্ম নেয় ধর্মবিশ্বাস। ভয়ংকর প্রকৃতিকে শান্ত করার জন্য তারা প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে দেবতারূপে পূজো করতে শুরু করে। তারা ঝড়, বৃষ্টি, মাটি, চন্দ্র, সূর্যকে দেবতারূপে মান্য করত। এবং এই সময় মানুষ মাতৃকাদেবীর মূর্তি গড়েছিল।

**যানবাহন:** এই যুগে মানুষ জলপথে যাতায়াতের জন্য মানুষ ভেলা অর্থাৎ কতগুলি কাঠের গুড়িকে একসঙ্গে বেঁধে ব্যবহার করত। এছাড়া এই সময় মানুষ চাকার ব্যবহার শেখে এবং স্থলপথে গোরুর গাড়িকে যান হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। তারা গাধা ও উটের পিঠে করে যাতায়াত করত।

**ভাষা:** নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক ও বিনিময় প্রথার ব্যাপকতার ফলে ভাব বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ক্রমে ভাষার উন্নতি ঘটে।

Govt. Gen. Degree College, Tehatta · Estd-2014 · Govt. of ...
HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT. GEN. DEG COLLEGE, TEHATTA

1st Sem
History (H)
Rinku Mondal
Roll — 10

# HISTORY

## CC – 2

## বিষয়ঃ ইনকা সভ্যতার সংস্কৃতি

**ইনকা সভ্যতার উদ্ভব** : বিশ্বের এক প্রাচীন রহস্যময় সভ্যতা হল ইনকা সভ্যতা। এই সভ্যতা সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে অনুমান করা হয়। আমেরিকার স্থানীয় আদিবাসীদের দ্বারা ইনকা সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কেচুয়া জাতির নেটিভ আমেরিকানদের দ্বারা ১৪ শতকের শেষ দিকে দক্ষিণ আমেরিকার অঞ্চলে এই সভ্যতা সূচনা হয়েছিল। এবং তা প্রায় ৩০০০ বছর ধরে স্থায়ী হয়েছিল।

**ইনকা সভ্যতার বিস্তৃতি** : ইনকা সাম্রাজ্য একসময় বিস্তৃত ছিল পেরু কসকো ভেলি থেকে দক্ষিণে বলিভিয়া চিলি এবং আর্জেন্টিনা পর্যন্ত। বর্তমান অনুসন্ধানের দ্বারা পেরুর কসকো ভেলিকে ইনকা সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু মনে করা হয়।

**ইনকা সভ্যতার মানুষদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য** : ইনকাদের আদি পুরুষেরা ছিল কিষকী। ইনকাদের প্রধান খাদ্য ছিল ভুট্টা ও আলু। ভুট্টা থেকে এরা চিচা নামে এক ধরনের পানীয় তৈরী করত। ইনকারা খাদ্য সংরক্ষণে খুবই দক্ষ ছিল। তাছাড়া তারা মাংস শুকিয়ে সংরক্ষণ করে রাখত। ইনকারা দক্ষ নির্মাতা ছিল। তারা সেতু নির্মাণে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। ইনকারা সামাজিক রীতিতে বিশ্বাসী ছিল। তারা ঘরের দেওয়াল তৈরী করত পাথর মাটি ঘাস দিয়ে এবং ধনী পরিবারের ঘরবাড়ি ছিল বড়ো বড়ো প্রাসাদ। এরা বিবাহ উপলক্ষে সামাজিক ভোজ করত। সমাজে রাজার স্থান সবার উপরে হলেও অভিজাত ও পুরোহিত শ্রেণীর সাহায্যে তিনি শাসনকার্য চালাতেন।

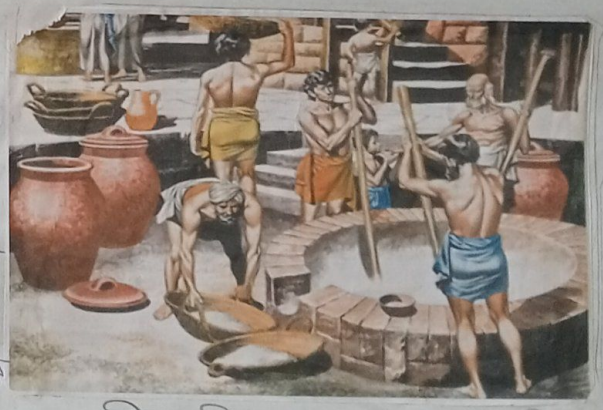

**ইনকা সভ্যার ধর্মীয় বিশ্বাস** : ইনকারা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ছিল। ইনকাদের প্রধান দেবতা ছিল সূর্য দেবতা ইনতি। তারা মনে করত ভিরাকোচা নামক এক দেবতা তিতিকাকা হ্রদের জল থেকে উঠে পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার করে। তাই তিতিকাকা হ্রদের জল ছিল পবিত্র। এরা পাহাড়ের উন্মুক্ত স্থানে বেদি তৈরী করত। বেদির উপর সূর্য দেবতার প্রতীক মূর্তি রেখে দিত এই ভাবে গড়ে ওঠা মন্দিরকে বলা হতো ইনতিহোয়াটানা।



চিত্রঃ ইনকা সভ্যতার সংস্কৃতি

Govt. Gen. Degree College, Tehatta
Estd-2014
Govt of West Bengal

Name – Labani Mondal
Class Roll – 06
Registraction No – 036554

HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT. GEN. DEG. COLLEGE, TEHATTA

# রোমের ধর্ম

রোমের ধর্ম : রোমান সম্রাট ট্রাজেন রোমের ধর্মকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রোমের দেব-দেবীকে গুরুত্ব দেওয়ার আগেই খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ দেখা দিয়েছিল। রোমের সম্রাট ট্রাজেনের উদ্দেশ্য একটি চিঠিতে বিথুয়ানিয়ার গভর্নর প্লিনি দ্য ইয়ংগার উল্লেখ করেছিলেন যে, খ্রিস্টান হিসাবে যে সব ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা হত। তাদেরকে জিজ্ঞেস করার পর তারা যদি নিজেদের খ্রিস্টান বলে স্বীকার করত। তখন শাস্তির ভয় দেখিয়ে তাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করা হত। যদি তারা বারবার একই কথা বলত তাহলে তাদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হত। আর যারা খ্রিস্টান ধর্মকে নিন্দা করত এবং রোমান দেব-দেবীর উপাসনার সময় তারা খ্রিস্টান ধর্মকে অস্বীকার করত, তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া, সঠিক বলে গণ্য করা হত। রোমান ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করার লক্ষ্যেই এই ধরনের অমানবিক কাজ করা হত। কোন ধর্ম যখন অপর একটি ধর্মকে অস্বীকার করে। তখন সেই ধর্মের দেব-দেবী সম্বন্ধে জেনে নেওয়া প্রয়োজন ও রোমানদের প্রাচীন দেব-দেবী এবং বিভিন্ন আচার-ব্যবহার রীতিনীতির প্রতি নজর দেওয়া উচিত। রোমান জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মত বিভিন্ন দেব-দেবীর পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। রোমানদের কাছে রোমান ধর্মকে "রিলিজিও লিসিটা" অর্থাৎ স্বীকৃত ধর্ম বলে মান্য করা হত। সেই কারণে তারা এই ধর্মকে বজায় রেখেছিল। জেরুজালেমে দিনে দুবার রোমান জাতির পক্ষ থেকে দুটো মেষ শাবক ও একটি ষাঁড় বলি দেওয়া হত। এই বলিগুলো একজন বা বহুদেবতাকে সন্তুষ্ট করত কি না, সেই বিষয়টি রোমানদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা হল – এই বিষয়টি রোমের অনুগত্যের যথেষ্ট প্রমাণ বহন করেছিল।

☐ রোমের প্রধান বারোটি দেব-দেবীকে একসঙ্গে দী কনসেনটেস নামে অভিহিত করা হতো। বারোজনের ছয়জন দেবতা ও ছয়জন দেবী ছিলেন। দেবতাদের মধ্যে ছিল — জুপিটার, মার্স, মারকিউরি, নেপচুন, অ্যাপোলো ও ভালকেন। আর দেবীরা ছিলেন — জুনো, ভেস্টা, মিনার্ভা, সেরেস, ডায়না ও ভেনাস।

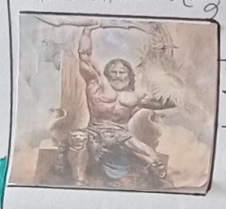



☑ **জুপিটার :-** রোমের সবথেকে শক্তিমান দেবতা ছিলেন জুপিটার তিনি ছিলেন সমস্ত দেবতাদের রাজা ও স্বর্গের অধিপতি। আকাশ, বজ্র বিদ্যুৎ, বাতাস, আইন; বিচার ও শক্তির দেবতা ছিলেন জুপিটার। তার সঙ্গে যুক্ত ঈগল।

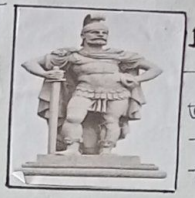



☑ **মারকিউরি :-** প্রাচীন রোমানদের বানিজ্য দেবতা ছিলেন মারকিউরি। প্রাচীনকালের রোমান ব্যবসায়ীরা যে মাসে আনুমানিক ভাবে মারকিউরি উপাসনা করত। পরবর্তী সময়কালের গ্রীক দেবতা হার্মিসের বৈশিষ্ট্যগুলি মারকিউরি উপর আরোপিত হয়েছিল। এবং মারকিউরি রোমানদের দেবতা বাহকরূপে পরিচিত হয়েছিল।

☑ **মার্স :-** রোমের পুরান অনুসারে যুদ্ধ, বসন্ত ও ন্যায়বিচারের দেবতা ছিলেন মার্স। মার্সের সমতুল্য গ্রীক দেবতা ছিলেন অ্যারেস। আদি রোমানদের কাছে মার্স পূজিত হতেন কৃষি এবং উর্বরতার দেবতা হিসাবে। গ্রিকরন দেবতার প্রভাবে মার্সের দেব রূপ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।

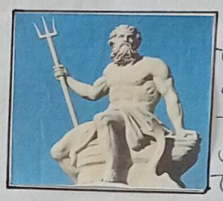



☑ **নেপচুন :-** রোমান পৌরানিক কাহিনী মতে সমুদ্র ও মিষ্টি পানির দেবতা। এর সমতুল্য গ্রিক দেবতা পোসেইডোন। এর অপর দুই ভাইয়ের নাম জুপিটার ও প্লুটো। পিতার নাম স্যাটার্ন। এই দেবতার উদ্দেশ্যে ২৩ শে জুলাই একটি উৎসব হতো। এর নাম ছিল Neptunalia. এই প্রাচীন উৎসবটি আদ্য রোমান যুগে প্রচলিত হয়েছিল। সে সময়ে নেপচুন ছিল ঝরনা, নদী, কূপ ইত্যাদি মিষ্টি পানির জলাশয় এবং জলের দেবতা।

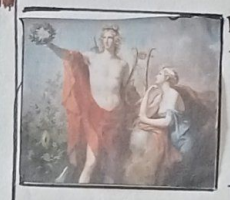



☑ **অ্যাপোলো :** মহান সম্মান ও উপাসনায় অধিষ্ঠিত, অ্যাপোলো ছিলেন সঙ্গীত, ভবিষ্যবাণী, তীরন্দাজ, চিকিৎসা এবং স্বর্গের গ্রীক রোমান দেবতা। অ্যাপোলোর উৎপত্তি হোমারিক 'হিমন টু অ্যাপোলো' তে বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে যে অ্যাপোলো ছিলেন জিউস এবং লেটোর পুত্র।

☑ **ভালকেন :** রোমের পুরান অনুসারে ভালকেন ছিলেন সমস্ত ধরনের আগুনের দেবতা। তার নামানুসারে আগ্নেয় গিরিকে ভলকান (vulcan) ভালকানকে মরুভূমি এবং ধাতুগলানো চুল্লির দেবতাও বলা হত। প্রাচীন রোমে 'ফার্নালিয়া' নামক একটি উৎসব পালন করা হত। পরবর্তীকালে ফার্নেস বা ধাতুগলানো চুল্লির দেবতা রূপে 'ফার্নালিয়া' উৎসবটি 'ভলকানিয়া' নামে পরিচিত হয়েছিল।

☑ **জুনো :-** জুনো ছিলেন প্রাচীন রোমান দেবী। রাষ্ট্রের রক্ষক এবং বিশেষ পরামর্শদাতা। তাকে গ্রীক পৌরানিক কাহিনীতে দেবতাদের রানী এবং প্রেম ও বিবাহের দেবী হেরার সমতুল্য করা হয়েছিল।

☑ **ভেস্টা :-** রোমানদের গৃহ, পরিবার ও গৃহের মধ্যে স্থিত অগ্নিকুণ্ডের রক্ষাকর্ত্রী ছিলেন। কুমারী দেবী ভেস্তা। রোমানদের অভিভাবক হিসাবে তার আরাধনা করা হতো। তার সম্মানে জুন মাসে ভেস্টালিয়া উৎসব আয়োজিত হতো।

☑ **মিনার্ভা :-** রোমের পুরান অনুসারে মিনার্ভা ছিলেন জ্ঞান, সঙ্গীত, কাব্য, ঔষধ, বয়ন, হস্তশিল্প; মায়াজাল ও ব্যাবসায় দেবী। সাধারনভাবে বলা যায়। এই কুমারী দেবী প্রধানত প্রজ্ঞা ও চারুকলার দেবী ছিলেন।

☑ **সেরেস :-**
প্রাচীন রোমান ধর্মে; সেরেস ছিলেন কৃষি, শস্য, উর্বরতা এবং মাতৃসম্পর্কের দেবী। সেরেস হলেন রোমের অনেক কৃষি দেবতার মধ্যে একমাত্র যিনি ডিআই কনসেন্টেসের মধ্যে তালিকাভুক্ত, রোমের সমতুল্য গ্রীক পুরানের বারোজন অলিম্পিয়ান।

☑ **ডায়না :-**
রোমানদের চাঁদের দেবী ছিলেন ডায়না (Diana)। ডায়নার সমতুল্য গ্রীক দেবী ছিলেন আর্টেমিস। ডায়না নারীদের দেবী রূপে পূজিত হতেন। এছাড়া তিনি শিকার, অরন্য, ছোটো নদী, ঝর্না, শিশুদের জন্মের দেবী ও সতীত্বের দেবী হিসেবেও পূজিত হতেন।


Aphrodite. Venus.

☑ **ভেনাস :-** রোমানদের প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী ছিলেন ভেনাস। প্রাচীন রোমে অবশ্য তাঁকে বসন্ত ঋতুর দেবী হিসাবেও বিবেচনা করত এই কারনে বসন্ত ঋতুর মাস এপ্রিল ছিল প্রেমের দেবী ভেনাসের নামে উৎসর্গীকৃত পবিত্র মাস।

HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT. GEN. DEG. COLLEGE. TEHATTA

Govt. Gen. Degree. College, Tehatta · Estd-2014 · Govt. of West Bengal

Name - Barsha Halder Roll No - 18 R.N - 036557

# হজরত মহম্মদ (সঃ)

**ভূমিকা:~**
হজরত মহম্মদের(সঃ)আবির্ভাব মুসলিম জগতে এক স্বর্ন অধ্যায়ের সূচনা করে। তাঁর আবির্ভাবে গোটা মুসলিম সম্প্রদায়কে নতুন দিশা দেখিয়ে ছিল।

**জন্ম ও বংশ পরিচয়:~**
আরবের মক্কা শহরে ৫৭০ খ্রীঃ হজরত মহম্মদের(সঃ) জন্ম হয়। তিনি কুরাইশ বংশের সন্তান ছিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি তার মা-বাবা কারো রই সাহার্য্য বেশিদিন পাননি জন্মের আগেই তাঁর বাবা মারা যান, আর জন্মের পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁর মা মারা যান তার পর তিনি তাঁর পিতামহের কাছে পালিত হতে থাকেন।

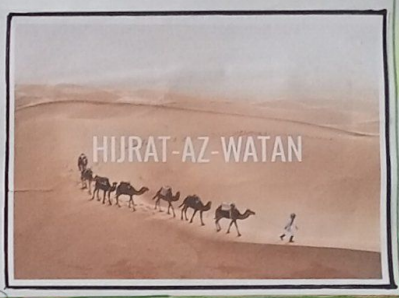

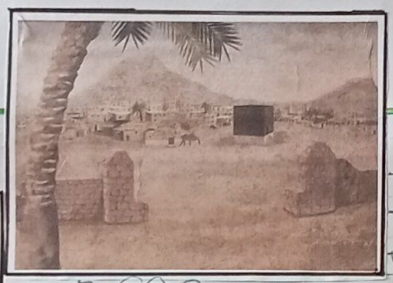

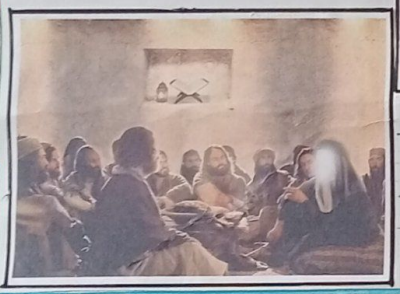








**ছেলেবেলা ও তাঁর প্রৌঢ় বেলা:~**
হজরত মহম্মদ(সঃ)যে সময় জন্ম গ্রহন করেছিলেন সে সময়ে আরবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধঃ পতন চরম সীমায় নেমে এসেছিল, সে সময় তাঁর আবির্ভাব যেন দূতের বার্তা বয়ে এনেছিল। ছেলে বেলা থেকেই তিনি ছিলেন চরম সৎ, নিষ্ঠাবান, সাহসী প্রবিত্র ধৈর্য্যশীল এবং নম্র। তিনি তাঁর চাচার নিকট থেকে শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি সমাজে যে সমস্ত দরিদ্র রোগগ্রস্থ ও দুর্গত মানুষ রয়েছে তাদের পাশে দাঁড়াতে কয়েক জন যুবকের সঙ্গে জোট বদ্ধ হয়ে হিল-ফুল-ফুজুল স্থাপন করেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল শান্তি স্থাপন ও ভাতৃত্ব বোধের জাগরন ঘটানো।

**শান্তিস্থাপন ও বিবাহ জীবন:~**
মহম্মদ কথার অর্থ হল অত্যন্ত প্রশংসনীয়, তার কৃত কার্যের জন্য সর্বদায় প্রশংসিত হতেন। তিনি এতটাই বিশ্বস্ত ছিলেন সকলের যে আরববাসী তাঁকে আল-আমিন উপাধী তে ভূষিত করেন। এর অর্থ ছিল বিশ্বস্ত। তিনি যখনই কোথাও কলহ দেখতেন তাঁর মন উদাসীন হয়ে যেত, কারন ঝগড়া-বিবাদ তার মনে অশান্তি সঞ্চার ঘটাতো। তৎকালীন সমাজে অরাজগতা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। তিনি ২৫ বৎসর বয়সে সিরিয়া সফরে গিয়ে এক সম্ভ্রান্ত মহিলার সাথে পরিচিত লাভ করেন। তার নাম ছিল খাদিজা। তিনি মহম্মদ(সঃ)এর সততা ও বংশপরিচিতি দেখে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিছুদিন দিন পর ব্যাবসা করার জন্য মক্কা থেকে মদিনায় যেতে হতো কিন্তু তাঁর মন ছিল মানুষ্য সমাজে শান্তি ও কুসংস্কার মুক্ত করা। তিনি ছিলেন একত্ত বাদি বা এক আল্লাহ তে বিশ্বাসী। তাই সমস্ত আরব বাসি কে মূর্তি পূজা থেকে বিরত থাকতে সমর্থ হন।

**ধর্মপ্রচার:~** মহম্মদ(সঃ) এর বয়স যখন চল্লিশ বৎসর তখন তিনি আল্লাহুর বানী শুনতে পান। তিনি পয়গম্বর রূপে অভিহিত হন। তার নতুন ধর্মমত হল - দরিদ্র সেবা, সকল সম্প্রদায় মানুষকে সমান চোখে দেখা, মূর্তি পূজা না করা, কাওকে কষ্ট না দেওয়া, অন্য ধর্মের লোকেদের ভালো বাসা, তাঁর এই বানী গুলি বইয়েতে লিপি বদ্ধ করা হয়েছে তার নাম "কোরান" তিনি যে ধর্ম প্রচার করেন তার নাম 'ইসলাম ধর্ম' ইসলাম ধর্মের সার কথা হল আল্লা এক, তাঁর অনুগামীরা ইসলাম ধর্ম কে সারা পৃথিবীর কোনে কোনে পৌঁছে দেন।

**ষড়যন্ত্র ও মৃত্যু:~**

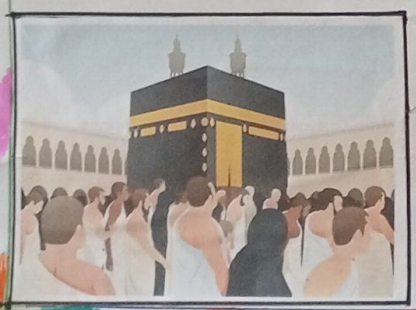



হজরত মহম্মদ (সঃ) এহেন সৎ প্রচেষ্টাকে ব্যার্থ করার জন্য কিছু অসাধু ব্যাক্তি তাঁর বিরুদ্ধে ভ্রান্ত মূলক কথা রটাতে থাকে। নবীর বানী গুলিকে অসত্য বলে প্রচার করতে থাকে কারন এই সকল বানী যদি মানুষ গ্রহন করে অসাধু ব্যাক্তিদের উপার্যনের পথ, পিতা মাতার দেখানো ভুল পথ থেকে মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে যাবে। কিন্তু নবীর এই মধুর বানী গুলি মানুষে মণে এমনভাবে গেঁথে যায় যা মানুষ কখনো ভুলতে পারিনি। মহম্মদ(সঃ) আল্লাহুর প্রতি অগাধ বিশ্বাস সাধারন মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে থাকে এবং দিনে দিনে তাঁর ভক্ত সংখ্যা সারা আরব দুনিয়া থেকে বহিঃ বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

এইভাবে তিনি মানবতার মন্ত্রে নতুন ভাবে দিক্ষীত করে মানব সম্প্রদায় কে নতুন ভাবে পথ দেখালেন। ৬৩২ খ্রীঃ এই ঈশ্বর প্রেরিত দূতের জীবনাবসান ঘটে।

Misipiya Nasrin Roll-8 Regn-036556

Govt. Gen. Degree. College, Tehatta · Estd-2014 · Govt of West Bengal

HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT GEN DEG COLLEGE, TEHATTA

# TEHATTA GOVERNMENT COLLEGE

TEHATTA * NADIA

# UNIVERSITY OF KALYANI

## BA HONS 3rd SEMESTER EXAMINATION - 2022-2023

B.A HONS
SUB – HISTORY
PAPER – SEC

# NAME - RAKHI BISWAS

ROLL - 3112157-2240165

Reg No - 036559

**SESSION : 2022-2023**

# শ্রী শ্রী কৃষ্ণরায় জিউ মন্দির

## সূচনা ঃ

নদীয়া জেলার জলঙ্গী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত একটি গ্রাম হল তেহট্ট। তেহট্টের প্রাচীন নাম ছিল ত্রিহট্ট। নদীয়া জেলার বিভিন্ন জায়গায় নানারকম প্রাচীন মন্দিরের স্থান। সেইরকমই নদীয়া জেলার এই তেহট্ট গ্রামে অবস্থিত একটি প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ স্থান বা মন্দির হল শ্রী শ্রী কৃষ্ণরায়। এই মন্দিরের সঠিক স্থান হল তেহট্ট বাজারের কাছে এবং জলঙ্গী নদী থেকে কিছু দূরে অবস্থিত ঠাকুর পাড়াতে তেহট্টের এই কৃষ্ণরায় মন্দিরটি বাংলার নিজস্ব শিল্পরীতি জোড়বাংলা রীতিতে তৈরী। এই ধরনের মন্দির মূলত টেরাকোটা শিল্পী দিয়ে তৈরী হয়। মন্দিরের দক্ষিণ দেওয়ালে অবস্থিত প্রতিষ্ঠা ফলক অনুসারে মন্দিরটির নির্মাণকাল ১৫০০ শকাব্দ বা ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পোড়ামাটির ফলকে এবং সংস্কৃত লিপিতে লিখিত প্রতিষ্ঠাফলক থেকে জানা যায় যে ১৫০০ শকাব্দের বৈশাখ মাসে শ্রী গোবিন্দের পাদপদ্মপুষ্পে মহানপুরুষ শ্রী রামদেব নাগ এই মন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দিরটি বাঁকুড়ার মল্লরাজাদের আমলের মন্দির। এই মন্দিরে ভগবান শ্রী শ্রীকৃষ্ণরায় শ্রী রাধিকা বিহীনভাবে বিরাজ করেন। শ্রী শ্রী কৃষ্ণরায় ঠাকুরকে

বিগ্রহটি কষ্টিপাথরের তৈরী। এই মন্দিরে রাধিকা না থাকার পেছনে বেশ কিছু কিংবদন্তি প্রচলিত আছে যে লোক মুখে শোনা যায় যে রামদেব তার কন্যা লক্ষ্মী দেবী কৃষ্ণরায়ের সেবা করতেন লক্ষ্মী দেবী ঠাকুরের সেবা করতে হঠাৎ একদিন অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। তখন স্থানীয় মানুষজন তাকে কলঙ্ক দিতে থাকলে তিনি মন্দিরের পিছনে পুকুরে গিয়ে দেহত্যাগ করেন। তারপর লক্ষ্মীদেবী তার পিতা রামদেবকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে জানান যে গ্রামের মানুষ তাকে কলঙ্ক দিতে থাকায় তিনি প্রাণ ত্যাগ করেছেন আর তিনিই ছিলেন স্বয়ং রাধিকা। তাই তিনি রাধা বেশে কৃষ্ণ রায়কে সেবা দিয়েছিলেন কিছু দিন পর গ্রামের রাস্তা দিয়ে এক শাঁখা বিক্রেতা এসেছিলেন তখন নাকি লক্ষ্মী দেবী তাকে দেখা দিয়ে তার হাতে শাঁখা পড়ান তখন শাঁখা বিক্রেতা তাকে জানান যে তিনি




তখন পুকুরে স্নান করতে এসেছেন তাহলে তাকে কীভাবে শাঁখা পড়াবেন এর উত্তরে লক্ষ্মীদেবী শাঁখা বিক্রেতাকে বলেন যে পাশের মন্দিরে তার বাবা রয়েছেন এবং তিনি তাকে মন্দিরের কুলুঙ্গি থেকে টাকা দিয়ে দেবেন শাঁখার দাম বাকি যথারীতি এই শাঁখা বিক্রেতা লক্ষ্মী দেবীকে

আশ্রয় নিয়ে তার বাবার কাছে এসে সমস্ত ঘটনা জানান। এবং তারপর রামদেব তাকে বলেন যে বর্তমানে তার মেয়ে আর জীবিত নেই।

## উৎসব ঃ

শ্রী শ্রী কৃষ্ণদেবরায়ের মন্দিরে অনেক উৎসব হয়ে থাকে বছরে। যেমন স্নানযাত্রা, রথযাত্রা পুনর্যাত্রা ঝুলনপূর্ণিমা জন্মাষ্টমী, অন্নকূট নবান্ন মাঘীপূর্ণিমা মহোৎসব দোলপূর্ণিমা হরিনাম সংকীর্তন আরও কতকথা নাই।

## নিত্যপুজো ঃ

প্রতিদিনের পুজোর মধ্যে থাকে মঙ্গলারতী ঠাকুর জাগরণ বৈকালভোগ অন্নভোগ বিষ্ণুসম্প্রদায় হরিনাম সহ সন্ধ্যারতী ও কীর্তন ভোগ নিবেদনের পরে ঠাকুরের শয়ন।

# কুষ্টিয়ার নাম ও ধর্মরাজ ঃ

দলাকী পাড়ার আমার ৩৪ নং মৌজায় জলঙ্গী নদী তীরস্থ গ্রাম হল কুষ্টিয়া পূর্বনাম গোপীনাথ বাগ কথিত আছে ২৫০০ খ্রিস্টাব্দের শেষ পর্যায়ে নদীয়ার অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ চুরি হয়ে পূর্ববঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কোনো অজানা কারণে কুষ্টিয়া গ্রাম অবস্থান করে বর্ধমান জেলার পাটুলির জমিদারের অধীন ছিল অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ মন্দির এই গ্রাম দূরে গোপীনাথের সন্ধান পাওয়ার পর মূর্তি মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। পরবর্তীতে নদীয়া রাজ্যের অধীনে অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ মন্দির আসার পরে কয়েকটি গ্রামের ছাড়া গোপীনাথের সেবার জন্য ধার্য হয় তার মধ্যে অন্যতম ছিল কুষ্টিয়া। নদীয়া রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় থেকে জমিদারি দেখা উচ্ছেদ পর্যন্ত অর্থাৎ ১২৩০ বছর জমিদারি শেষে তাই কুষ্টিয়ার নাম ছিল গোপীনাথ বাগান।

# কৃষ্ণনগরের সিদ্ধেশ্বরী ঃ

বর্তমান পলাশীপাড়া আমার কৃষ্ণনগর গ্রামের পূর্ব দিকে জলঙ্গী নদীর পরিত্যক্ত খাত বা মরাগাঙনি নামে পরিচিত এই খাতের পশ্চিমপাড়ে বকুলগাছ বেষ্টিত জায়গায় একটা কুল গাছতলায় সিদ্ধেশ্বরী স্থান। বৈশাখ মাসের তৃতীয় মঙ্গলবারে বার্ষিক পুজো হয়। কোনো মূর্তি নেই। লোকশ্রুতি এক রাজা গণেশের পর তাঁর ধর্মান্তরিত পুত্র যদু ওরফে জালালউদ্দিন গৌড়ের সিংহাসনে বসে হিন্দুরাজ পরিবারের লোকদের জোরেবলে কৌশলে মুসলিম করতে লাগলো। রাজ পরিবারের কয়েকজন তাঁদের কুলো দেবী কিছু পুরোহিত রাজকর্মচারী নিয়ে নৌকা যোগে দক্ষিণ বঙ্গে পালিয়ে আসে। এই নদী খাত তখন প্রবাহমান ছিল তারা এই খাতের পাশে জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে আশ্রয় নেয় কুলগাছের তলায় সিদ্ধেশ্বরী ঘট প্রতিষ্ঠা করে পুজো পার্বন শুরু করে এখনো বছরে একবার বার্ষিক পুজো হয়।

## ছিন্নমস্তার মেলাঃ

তেহট্ট থানার বার্নিয়ার আছে (গোরীবপুরে) ছিন্নমস্তার মেলা বসে প্রতিমাসের অগ্রহায়ন মাসের শুক্লাষষ্ঠী বা মুদগা ষষ্ঠীর দিন থেকে ছিন্নমস্তার পূজা শুরু হয় তো ১৫ দিন পূজাকে কেন্দ্র করে বিরাট মেলা বসে ছিন্নমস্তার পূজা ও মেলা বহুকাল আগে শুরু হয় অবিভক্ত বাংলায় মেহেরপুর মহাকুমা শহরের সন্নিকটে দারিয়াপুর গ্রামে দেশ বিভাগের ফলে দারিয়াপুর গ্রাম থেকে আগত ছিন্নমূল কিছু মানুষ বর্নি গরিবপুর তেহট্টে বসবাস শুরু করেন। এ ব্যাপারে নেতৃত্ব দেন দারিয়াপুর থেকে আগত ব্যবসায়ী কালু বিশ্বাস ভারত ভূমি এই পূজা মেলা কয়েক বছর পরে পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করেছে। ছিন্নমস্তার মেলা নিয়ে মিথ আছে দারিয়াপুর মাহাত্ম্য প্রবীন খুব বাকিস্তু ও প্রাচীন গ্রাম এই গ্রামে জমিদার জ্যোতিরিন্দ্র ও ৬৬ ক্ষিতিশীত নকুরী জীবীদের বাস ছিল। ১৩২৭ বঙ্গাব্দে দারিয়াপুরে হীরালাল বিশ্বাসের সভাপতিত্বে সমিতি হয় "নদীয়া সাহিত্য সম্মিলনী"। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় সার্থক নামে মাসিক পত্রিকা (নদীয়া কাহিনী কুমুদনাথ মল্লিক পৃ. ৪০২) এই গ্রামের মাঝে রাস্তায় তো মাঝামাঝি দাকো কালীপুজো

হত। কয়েকজন অন্য ধর্মের দুষ্কৃতি রাতে গোপনে কালীমূর্তি ভাঙচুর করে। পরবর্তীতে দন্ডীর ভোরে জোর অনুরূপ তখন ওই পুরোহিত স্বপ্নাদেশ পান ছিন্নমস্তারূপে মার পূজা করার। সেই থেকে দাবিয়াপুরে ছিন্নমস্তার পূজা ও মেলার প্রচলন। সেটিও দেখা বিগতের প্রায় একশো দেড়শো বছর পূর্বে।

---

Raghunath Ray
HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT. GEN. DEG. COLLEGE, TEHATTA
TEHATTA, NADIA- 741160

Name: Chhanda Ghosh
Regn No: 044084
Semester: 6th

# দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

| মিত্রশক্তি | অক্ষশক্তি |
| --- | --- |
| মিত্রশক্তি বলতে সেসব দেশকে নির্দেশ করা হয়, যারা অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। 1941 সালে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন মিত্রশক্তি গঠন করে। পরবর্তীতে ফ্রান্সও মিত্রশক্তিতে যোগ দেয়। | অক্ষশক্তির প্রধান তিনটি রাষ্ট্র হল জার্মানি, ইতালি এবং জাপান। এই তিনটি রাষ্ট্র 1940 সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি ত্রিপাক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে একটি সামরিক জোট গড়ে তোলে। এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভাবে অক্ষশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। |
| এর নেতৃত্বে ছিলেন ফরাসি প্রতিরোধের নেতা চার্লস দি গল, উইনস্টন চার্চিল, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী, জোসেফ স্ট্যালিন, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী এবং ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি। | এর নেতৃত্বে ছিলেন নাৎসি জার্মানির চ্যান্সেলার অ্যাডলফ হিটলার, বেনিটো মুসোলিনি, ইতালির প্রধানমন্ত্রী; এবং হিদেকি তোজো, জাপানের প্রধানমন্ত্রী। |
| প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধকালীন জোটের মধ্য দিয়ে মিত্র শক্তি-গুলো অস্তিত্ব লাভ করে। | 27 সেপ্টেম্বর, 1940-এ জার্মানি, ইতালি এবং জাপান ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, যা ত্রি-শক্তি চুক্তি নামেও পরিচিত। |
| মিত্ররা অক্ষশক্তিকে পরাজিত করতে জার্মানি, ইতালি এবং জাপানে ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান ঘটাতে এবং জার্মানিকে আবার ক্ষমতায় উঠতে বাধা দিতে একত্রিত হয়েছিল। | অক্ষশক্তি দুটি সাধারণ স্বার্থের উপর গঠিত হয়েছিল: আঞ্চলিক সম্প্রসারণ এবং সোভিয়েত কমিউনিজমকে উৎখাত করা। |
| মিত্রদের একটি উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল যার বিচারে ও ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সংবাদিকরা ছিলেন। | কর্তৃর স্বৈরশাসক অক্ষের স্বৈরশাসক দিয়েছিলেন, কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে। |

**প্রত্যক্ষ কারণ:** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারনসমূহের মধ্যে বৃহৎ পরিসরে কারন ছিল 1933 সালে অ্যাডলফ হিটলার ও তার নাৎসি পার্টির জার্মানির রাজনৈতিক অধিগ্রহন এবং এর আগ্রাসী বৈদেশিক নীতি; এবং ক্ষুদ্র পরিসরে কারন ছিল 1920-এর দশকের ইতালীয় ফ্যাসিবাদ এবং 1930-এর দশকে জাপান সাম্রাজ্যের চীন প্রজাতন্ত্রের আক্রমন।

Govt. Gen. Degree College, Tehatta · Estd-2014
HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT. GEN. DEG COLLEGE TEHATTA

# দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

## দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট:

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানবসভ্যতার ইতিহাসে এ যাবৎকাল পর্যন্ত সংঘটিত সর্ববৃহৎ এবং সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল, এই ছয় বছর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়সীমা ধরা হলেও ১৯৩৯ সালের আগে এশিয়ায় সংঘটিত কয়েকটি সংঘর্ষকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অংশ হিসেবে গণ্য করা যায়।

- **তারিখ:-** ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ – ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ (৬ বছর, ১ দিন)
- **অবস্থান:-** ইউরোপ, প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন, মধ্যপ্রাচ্য, ভূমধ্যসাগর এবং আফ্রিকা এছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা।

## : বিবাদমান পক্ষ :

### মিত্রশক্তি

1. সোভিয়েত ইউনিয়ন
2. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
3. যুক্তরাজ্য
4. চীন প্রজাতন্ত্র

অধিকৃত দেশসমূহ:
- পোল্যান্ড
- গ্রিস
- নেদারল্যান্ডস
- তৃতীয় ফরাসি প্রজাতন্ত্র
- ব্রাজিল
- কুবা
- নরওয়ে
- কানাডা
- মঙ্গোলিয়া
- ফিলিপাইন
- নিউজিল্যান্ড
- বেলজিয়াম
- দক্ষিণ আফ্রিকা
- ডেনমার্ক
- চেকোস্লোভাকিয়া
- ইথিওপিয়া
- মেক্সিকো
- যুগোস্লাভিয়া
- ব্রিটিশ ভারত

### অক্ষশক্তি

1. জার্মানি
2. জাপান
3. ইতালি
4. হাঙ্গেরি
5. রোমানিয়া
6. বুলগেরিয়া

অন্যান্য সহযোগী শক্তি:
- ফিনল্যান্ড
- থাইল্যান্ড
- ইরাক
- আলবেনিয়া
- ক্রোয়েশিয়া
- স্লোভাকিয়া

Japan's Greater East ASIA Co-Prosperity Sphere Puppets
- মাঞ্চুকুয়ো
- চীন – নানজিং
- বার্মা
- ফিলিপাইন
- মেংজিয়াং
- আজাদ হিন্দ

## হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতি:

মিত্রশক্তি:
- সামরিক প্রাণহানি :→ ১,৬০,০০,০০০ – এর বেশি
- বেসামরিক প্রাণহানি :→ ৪,৫০,০০,০০০ – এর বেশি
- সর্বমোট প্রাণহানি :→ ৬,১০,০০,০০০ – এর বেশি (১৯৩৭-৪৫)
- মিত্রশক্তির নেতৃবৃন্দ → ইওসিফ স্তালিন, ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট, চার্চিল, চিয়াং-কাই-শেক

অক্ষশক্তি:
- সামরিক প্রাণহানি → ৮০,০০,০০ – এর বেশি
- বেসামরিক প্রাণহানি → ৪০,০০,০০০ – এর বেশি
- সর্বমোট প্রাণহানি → ১,২০,০০,০০০ – এর বেশি (১৯৩৭-৪৫)
- অক্ষশক্তির নেতৃবৃন্দ → অ্যাডলফ হিটলার, হিরোহিতো, হিদেকি তোজো, বেনিতো মুসোলিনি

## দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণসমূহ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলিকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা → ① পরোক্ষ কারণ ② প্রত্যক্ষ কারণ। কারণগুলি নীচে আলোচনা করা হল →

① ভার্সাই সন্ধির ত্রুটি → ভার্সাই সন্ধি জোর করে জার্মানির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাতে জার্মান জাতির মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা জেগে উঠেছিল। তাই ই. এইচ. কার বলেন → "The treaty of Versailles sowed the seeds of world War II."

② উগ্র জাতীয়তাবাদ → জার্মানির উগ্র জাতীয়তাবাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল। এই উগ্র জাতীয়তাবাদকে চরিতার্থ করতে নাৎসি দলের ক্ষমতা দখলের মধ্যে দিয়ে জার্মানিতে প্রাক-বিশ্বযুদ্ধকালীন সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

③ হিটলারের পররাষ্ট্রনীতি → হিটলারের পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা ছিল "Pan Germanism" হিটলার এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।

④ জাপানের আগ্রাসী নীতি → প্রাচ্য তথা এশিয়া মহাদেশের জাপান আগ্রাসী নীতি নিয়েছিল। বিশেষ করে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণকে বিশ্ব পরিস্থিতিকে উত্তাল করে তুলেছিল।

⑤ ইতালির আগ্রাসন → মুসোলিনির নেতৃত্বে ইতালির পররাষ্ট্রনীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়। বিশেষ করে ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণ পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে।

⑥ জাতিসংঘের ব্যর্থতা → লিগ বৃহৎ শক্তিবর্গের অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অপারগ থাকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন ঘনীভূত হয়েছিল। আবিসিনিয়া আক্রমণ ইতালির ও জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের ঘটনা লিগ দুর্বলের ভূমিকা পালন করে।

**প্রত্যক্ষ কারণ →** হিটলারের পোল্যান্ড আক্রমণ → রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষচুক্তি গঠন হওয়ার পর হিটলার পোলিশ করিডর দাবী করেন। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড এই দাবির বিরোধিতা করে পোল্যান্ডের পক্ষ নেবে বলে হুমকি দেয়। এই হুমকিকে নস্যাৎ করে হিটলার ১৯৩৯ খ্রিঃ ১লা সেপ্টেম্বর পোল্যান্ড আক্রমণ করে বসেন। ফলস্বরূপ ওই বছরের ৩ সেপ্টেম্বর শুরু হয় বিশ্বযুদ্ধ।




১৯৩৯ খ্রীঃ ইউরোপের মানচিত্র

Govt. Gen. Degree College Tehatta
Estd-2014
Govt of West Bengal

HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT GEN. DEG COLLEGE TEHATTA

DIPASHREE BISWAS
6th Semester (HISTORY)
Reg No : 044085
CC - XIV

# দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট

## মিত্রশক্তি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তি বলতে সেসব দেশকে নির্দেশ করা হয়, যারা অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) সময় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, মিত্রশক্তির দেশ গুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল প্রত্যক্ষভাবে অক্ষশক্তির আগ্রাসনের কারনে অথবা অক্ষশক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হতে পারে এমন ভয়ের কারনে, ১৯৪১ সালের পরে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন এই তিন রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ, যারা একত্রে ("বৃহৎ তিন" নামে পরিচিত ছিল) এবং চীন মিত্রশক্তি গঠন করে, পরবর্তীতে বৃহৎ রাষ্ট্র ফ্রান্সও মিত্রশক্তিতে যোগ দেয়, এছাড়াও আরো যেসব রাষ্ট্র মিত্রশক্তিতে যোগ দেয় তারা হল অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ব্রাজিল, কানাডা, চেকোস্লোভাকিয়া, ইথিওপিয়া, গ্রীস, ভারত, মেক্সিকো, নেদারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, ফিলিপাইন কমনওয়েলথ, পোল্যান্ড এবং যুগোস্লাভিয়া. ১৯৪১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন ডিলানো রুজভেল্ট মিত্রশক্তিকে জাতিসংঘ নামে প্রচার করেন. তিনি বৃহৎ তিন (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও সোভিয়েত ইউনিয়ন) এবং চীনকে একসাথে ট্রাস্টিশিপ অব পাওয়ারফুল নামে অভিহিত করেন, পরে যা ফোর পুলিশম্যান নামে পরিচিতি পায়, পরবর্তীতে ১৯৪২ সালে একটি ঘোষনার মাধ্যমে বর্তমান জাতিসংঘের গোড়াপত্তন হয়, ১৯৪৫ সালের জুলাই আগস্ট মাসে পটসডাম সম্মেলনে রুজভেল্ট প্রস্তাব করেন চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহে শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার রূপরেখা প্রনয়ন করবে, যার মাধ্যমে পরবর্তীতে পররাষ্ট্র মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয়,

## অক্ষশক্তি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অক্ষশক্তি বলতে সেসব দেশকে নির্দেশ করা হয়, যারা মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) সময় যুদ্ধ ঘোষনা করেছিল. অক্ষশক্তির প্রধান তিনটি রাষ্ট্র হল জার্মানি, ইতালি এবং জাপান. এই তিনটি রাষ্ট্র ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে একটি সামরিক জোট গড়ে তোলে, এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভাবে অক্ষশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, এই বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর সাথে সাথে তাদের ইউরোপ, আফ্রিকা, পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত কলোনিগুলিও অক্ষশক্তির অংশ হয়ে যায়, মিত্রশক্তির মতই অক্ষশক্তিতেও বেশ কিছু দেশ নাম লিখিয়ে যুদ্ধ চলাকালেই তা প্রত্যাহার করে নেয়, ১৯৩৬ সালের নভেম্বরে ইতালীর একনায়ক বেনিতো মুসোলিনি প্রথম বার অক্ষ শব্দটি আলোচনায় আনেন. তিনি রোম-বার্লিন অক্ষের উত্থানের সময় এই অক্ষের কথা বলেন, পরবর্তীতে রাষ্ট্রদুটি জোট গঠন করে, মুসোলিনি এই জোটকে প্যাক্ট অব স্টীল বলে অভিহিত করেন,

আনুষ্ঠানিকভাবে অক্ষশক্তি নামকরন করা হয় ১৯৪০ সালে জার্মানি, ইতালি এবং জাপান ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরের পর. পরবর্তীতে হাঙ্গেরী (20 শে নভেম্বর, ১৯৪০), রোমানিয়া (23 শে নভেম্বর, ১৯৪০), স্লোভাকিয়া (24 শে নভেম্বর, ১৯৪০) এবং বুলগেরিয়া (১ লা মার্চ, ১৯৪০) ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে,

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ :

(i) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য অনেকেই ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভার্সাই সন্ধিকে দায়ী করে থাকেন. তাদের মতে, ভার্সাই সন্ধির মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল. ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ভার্সাইয়ে সমবেত নেতৃমন্ডলী নিছক প্রতিশোধ স্পৃহা দ্বারা পরিচালিত হয়ে পরাজিত জার্মানির উপর এই অপমানজনক, প্রতিশোধমূলক, স্বার্থপর ও সর্বনাশা ভার্সাই চুক্তি বলপূর্বক চাপিয়ে দেন.

(ii) জার্মানিতে নাৎসি দল এর উত্থান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারন হিসেবে চিহ্নিত. এই দলের উদ্দেশ্য ছিল ভার্সাই সন্ধিকে বাতিল করা, ইউরোপের জার্মান ভাষাবাসী অঞ্চলগুলিকে জার্মানির অন্তর্ভুক্ত করে বৃহত্তর জার্মানি গঠন করা.

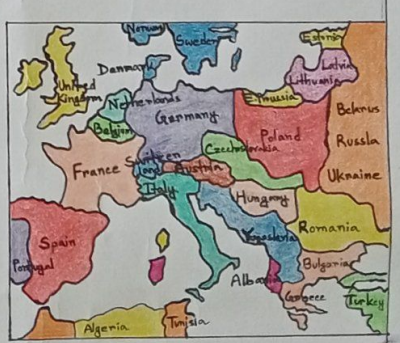




(iii) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারন হল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহা. ভার্সাই চুক্তির ফলে জার্মানি ও তার উপনিবেশগুলি থেকে বঞ্চিত হয় এবং মিত্রশক্তিবর্গ তা নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেয়,

(iv) মিত্রপক্ষীয় বিভিন্ন দেশের অনৈক্য ও স্বার্থ সংঘাত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে, যেমন- মার্কিন সেনেট ভার্সাই সন্ধি অনুমোদন না করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ রাজনীতি থেকে সরে যায়. ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ নিয়ে পারস্পারিক দ্বন্দ্ব দেখা দিলে ব্রিটেন সম্ভাব্য জার্মান আক্রমন থেকে ফ্রান্সের নিরাপত্তা বিধানের কোনো দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে,

(v) ইংরেজ, ফরাসি এবং মার্কিন ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রনীতিজ্ঞরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানিকে দায়ী করলেও ইঙ্গ-ফরাসি পক্ষের দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে ইউরোপে শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য ইঙ্গ ফরাসি ঐক্য অপরিহার্য ছিল, কিন্তু এসময় দুই রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়,

Govt. Gen. Degree College, Tehatta
Estd-2014
Govt of West Bengal

HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT GEN DEG.COLLEGE. TEHATTA

DATE:-30.5.2023

# UNIVERSITY OF KALYANI

## TEHATTA GOVERNMENT COLLEGE

INTERNAL ASSIGNMENT EXAMINATION
6th SEMESTER

NAME : RAKESH DHAR

SUBJECT : HISTORY (HONOURS)

ROLL NO : 3116157-2003849

REGN NO: 044096 of 2020-2021

PAPER : DSE-3 (History of women India)

## ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের অবদান

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে নারীশক্তি বরাবরই প্রাত্য। অন্তরালস্থ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মেয়েদের সামাজিক অবস্থানের কারণেই ঘর থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন কার্যকলাপে অংশগ্রহণ স্বাভাবিক ছিল না। তবে এই সীমাবদ্ধতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছিল সমাজের ওপরতলার অবস্থানকারী মেয়েদের ক্ষেত্রে। দরিদ্র, দলিত শ্রেণীর মেয়েরা, যাদের কায়িক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হত। তাদের পক্ষে বাইরের কাজে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হত। যদিও আবার সামাজিক কারণেই এই অংশের মানুষ, অন্তত বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামে সেইভাবে অংশ নিতে পারেনি। কিন্তু সাঁওতাল বিদ্রোহকে আমরা যদি প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ধরি, তাহলে দেখব সেদিনের ব্রিটিশ বিরোধী লড়াইতে সিধু, কানু মূর্মুর সঙ্গে একই সারিতে ছিল তাদের দুই বোন ফুলো আর ঝানো যাদের নাম আমরা খুব কমই শুনতে পাই।

সাঁওতাল বিদ্রোহের দু বছরের মধ্যে সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয় — এবং এই সিপাহী বিদ্রোহের পুরোভাগে ছিলেন ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ। তবে রানীর আসন থেকে সিপাহী বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তা ছিল অভিজাত শ্রেণীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ। এর আগে এবং পরে কেন কিছু রাজপরিবারের মহিলা সদস্যরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিলেন ব্রিটিশদের হাত থেকে রাজত্ব বাঁচানোর তাগিদে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মেয়েরা শিক্ষার আলোকে আলোকিত হতে থাকে। অভিজাত পরিবারের বাইরেও মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পেয়ে সমাজ এবং দেশকে চিনতে শেখে। ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বীজ প্রবেশ করে অন্দরমহলেও। আবার ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এক ভিন্ন গতি পেলেও এই পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে ইতিহাসবিদরা প্রায় নীরব। যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজা রামমোহন রায়,

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্য মনীষীদের বিভিন্ন সমাজে সংস্কারমূলক কাজের সাথে সাথে যে নারীমুক্তির আন্দোলনের বীজবপন হয়েছিল। তার থেকেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভেতরেই জেগে উঠতে থাকে আর এক নতুন আন্দোলন - নারীমুক্তি নারীর ক্ষমতায়নের আন্দোলন। এইসময়েই বাংলার নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবী, মহারাষ্ট্রের কাশিবাঈ কানিতকরের লেখনীতে রচিত হতে থাকে নারীর নিজস্ব এবং এতান্ত কাহিনীগুলি; কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, আনন্দীবাঈ যোশীরা চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করেন। বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর মুখে চলে যাওয়া মেয়েদের বাঁচিয়ে তোলার জন্য। আলোকপ্রাপ্ত মহিলারা যেমন ঠাকুর পরিবারের স্বর্ণকুমারী দেবী, পুনের পন্ডিতা রামাবাঈ সরস্বতী নারী সমিতি গড়ে তোলেন। মহিলাদের এই সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ তাদের উৎসাহিত করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও স্বতঃপ্রণোদিত অংশগ্রহণ করতে।

বিংশ শতাব্দীর একদম শুরুতে সরলা দেবী চৌধুরানীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে প্রথম সারা ভারতব্যাপী নারীদের জন্য সমিতি 'ভারতস্ত্রী মহামন্ডল'। এই সমিতির মূল উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে ভারতীয় মহিলাদের মনে অধিকার এবং গনতান্ত্রিক চেতনা সঞ্চার করা। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ১৮৮৯ এর অধিবেশন থেকেই মহিলা প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। ১৯০৪ খ্রীঃ সরোজিনী নাইডু কংগ্রেসের সভায় কবিতা পাঠ করতে আমন্ত্রিত হন এবং তাঁর জোরালো বক্তব্যের মাধ্যমে কংগ্রেস নেতৃত্বকে মুগ্ধ করেন। কিন্তু এপর্যন্ত মহিলাদের ভূমিকা ছিল গোটাকুটি সীমিত এবং অল্প সংখ্যক মহিলাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ যাঁরা দেশবাসীর প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেননি। কংগ্রেসে যোগদানকারী মহিলা সদস্যরা এবং তাদের পরিবারবর্গ অধিবেশনে যোগ দিতে পারত। যদিও মহারাষ্ট্রে সাবিত্রীবাঈ ফুলের নেতৃত্বে আর এক আন্দোলনের সূচনা ঘটেছিল - দলিত, পিছিয়ে থাকা পরিবারের মহিলাদের শিক্ষিত করা এবং বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে তাদের

রুখে দাঁড়ানোর জন্য আত্মমর্যাদা জাগ্রত করা। কিন্তু ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে জোয়ার নিয়ে এল। শুধু শিক্ষিত, উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মহিলারা নন, সাধারণ ঘরের গৃহবধূরা এই আন্দোলনের জোয়ারে ভেসে গেল। বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলনের স্রোত সমাজের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাকে ভেঙে সর্বস্তরের মানুষকে এক পথে নিয়ে এল। মুকুন্দদাসের রচিত নাটক ও গানে মেতে উঠল বাংলার গ্রাম। গ্রামের অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত গৃহবধূরা তাদের গায়ের সোনার গয়না খুলে এনে দিল স্বদেশী আন্দোলনের জন্য।

১৯০৫ সাল থেকেই কংগ্রেসের নরমপন্থা বাংলায় জন্ম দেয়, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে একটি অন্য ধারার লড়াই, সশস্ত্র বিপ্লবীদের আন্দোলনেও মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। যদিও বেশির ভাগ মেয়েদের অবদানই হারিয়ে গিয়েছে বিস্মৃতির অতলে। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অভিযানে পুরোভাগে ছিল প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও কল্পনা দত্ত। বিপ্লবী আন্দোলনে আরও বিভিন্নভাবে যুক্ত হয়েছিলেন শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, বীণা দাস, শান্তিসুধা ঘোষ, সুহাসিনী গাঙ্গুলি, লতিকা সেন, কমলা দাসগুপ্ত, কমলা চ্যাটার্জির মত অসংখ্য মহিলা। এই বিপ্লবী নারীরা সেই সময়ের বিভিন্ন সামাজিক বন্ধনকে অতিক্রম করে পুরুষ বিপ্লবীদের সাথে যৌথ লড়াই করে গেছেন এবং বহু আত্মত্যাগের নমুনা রেখেছে।

১৯২০-২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন যখন শুরু হয় তখনও মহিলাদের অংশগ্রহণ। বিশেষ করে বিদেশী পণ্য বর্জনে তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন। মুকুন্দদাসের 'ভেঙ্গে ফেল রেশমী চুড়ি, বঙ্গনারী কভু হাতে আর পোরো না।' — এই গানে সাড়া দিয়েছিল গ্রাম গ্রামান্তরের বহু মহিলারা। পরবর্তীকালে ১৯৩০-৩২ সালে দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলনে মহিলাদের এই অগ্রগণ্য ভূমিকা আমরা দেখতে পাই। এই আন্দোলন ছাড়া ৪২-এর আন্দোলনে মেদিনীপুরের বীরাঙ্গনা

মাতঙ্গিনী হাজরা শহিদ হন।

যদিও পরাধীন ভারতে কংগ্রেসের নেতৃত্বে খুব কম মহিলাকেই দেখা গেছে, ১৯২৫ সালে সরোজিনী নাইডু জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী নির্বাচিত হন। তিনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি সভানেত্রীর পদ অলংকৃত করেছিলেন। তাঁর আগে অবশ্য জন্মসূত্রে আইরিশ অ্যানি বেসান্ত ১৯১৭ সালে কংগ্রেসের সভানেত্রী হন। স্বাধীনতার আগে এই দুজন ছাড়া তৃতীয় মহিলা সভানেত্রী হয়েছিলেন নেলী সেনগুপ্ত। অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরোদস্তুর অংশগ্রহন করলেও নেতৃত্বে তাঁরা সেইভাবে জায়গা পাননি।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম দিকে ব্রিটিশরাজের প্রতি নরমপন্থী মনোভাব বাংলা এবং দেশের অন্য অঞ্চলে জন্ম দেয় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যেও একই সময়কালে তৈরী হয়েছিল চরমপন্থী নেতৃত্ব যা পরবর্তীকালে কংগ্রেস পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে থাকেন। এই সময়েই কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস ও সশস্ত্র বিপ্লব — এই দুটি ধারার বাইরে আরও এক তৃতীয় ধারার আন্দোলন তৈরী হয় যা কমিউনিস্টদের অংশগ্রহন উদ্বুদ্ধ গন আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ তৈরী করা। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তৈরী হয় হলেও অচিরেই ভারতে ছড়িয়ে পড়ে তাদের কার্যকলাপ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে সমস্ত বিপ্লবীরা আন্দামান সেলুলার জেলে নির্বাসিত হন বা ভারতের মধ্যে জেলখানাতেই কারারুদ্ধ হন তাঁরা অনেকেই জেলে বন্দি থাকাকালীন কমিউনিস্ট আদর্শে অনুপ্রানিত হন এবং পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কল্পনা দত্তর মত মহিলা সদস্যরাও। মহিলা সমিতি গড়ে তোলার জন্যও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা কাজ করতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মনিকুন্তলা সেন, লতিকা সেন ইত্যাদী। কিছুদিন বাদে এই সমিতি তাদের মুখপত্র পত্রিকা প্রকাশ করে যাতে লেখিকা হিসবে থাকেন নামকরা লেখিকারা।

কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তা ছিল শুধুমাত্র দেশ নামক ভূখণ্ডের স্বাধীনতা নয়, তা ছিল সামগ্রিকভাবে দেশের মানুষের স্বাধীনতা অর্জন। স্বাধীন দেশে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ নয়, শ্রেণীহীন সমাজ তোলাই ছিল লক্ষ্য। তাই জাতীয়তাবাদী দলগুলি, যাদের পরিচালনা ছিল ভারতের সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া শ্রেণী, তাদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ের সংঘাত লাগে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এবং কমিউনিস্ট পার্টি একসঙ্গেই আন্দোলনের শরিক হন। তারমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা সদস্যদের অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

নারী স্বাধীনতা সংগ্রামীরা অতীতে যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে সেই বীরত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে এখনকার নারীরা সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে এগিয়ে চলেছে পুরুষের সাথে পা মিলিয়ে। অত্যাচারী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের থেকে মুক্তি পেতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। একদিকে তারা নিজেদের ভবিষ্যতের নিরাপত্তাকে দূরে সরিয়ে বিপ্লবের পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন তাদের স্বামী, সন্তান, ভাইদের। অন্যদিকে তারা কখনো ঘরের ভিতর থেকে আবার কখনো বাইরে বেরিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। পুরুষের সাথে থেকে পাশে থেকে সক্রিয়ভাবে বা নেপথ্যচারিণী হয়ে যোগ্য সহযোদ্ধার পরিচয় দিয়ে গেছেন।

Raghunath Roy

HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT. GEN. DEG. COLLEGE, TEHATTA
TEHATTA, NADIA- 741160

# UNIVERSITY OF KALYANI

# TEHATTA GOVERNMENT COLLEGE

TEHATTA, NADIA

B.A. GENERAL 6TH SEMESTER : 2022-2023

SUBJECT: HISTORY

NAME- BHASA DAFADAR

REG NO-044159

ROLL NO: 3316157-2043905

SESSION-2020-2021

# ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের অবদান

অত্যাচারী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের থেকে মুক্তি পেতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। একদিকে তারা নিজেদের ভবিষ্যতের নিরাপত্তাকে দূরে সরিয়ে বিপ্লবের পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন তাদের স্বামী, সন্তান ও ভাইদের। অন্যদিকে তারা কখনও ঘরের ভেতর থেকে কখনও বাইরে বেরিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। পুরুষের সাথে থেকে পাশে থেকে সক্রিয় ভাবে না নেপথ্যচারিনী হয়ে যোগ্য সহযোদ্ধার পরিচয় দিয়ে গেছেন। আজ ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবসে আমাদের মঞ্চের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সমস্ত বীর যোদ্ধা ও অগ্নিকন্যাদের জানাই সশ্রদ্ধ প্রনাম ও শ্রদ্ধাঞ্জলী। ভারতের এই সব অগ্নি-কন্যারা হলেন ———

## ◻ রানি ভেলু নাচিয়ার

৩রা জানুয়ারি ১৭৩০ সালে রামনাথপুরমে জন্মগ্রহন করেন ভেলু নাচিয়ার। শিবগঙ্গা রাজ্যের রানী ভেলু নাচিয়ার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রথম ভারতীয় রানী। তাঁর স্বামী মুথুভেদু-নথাপেরিয়া উদেয়াথেভরকে ব্রিটিশ সৈন্য এবং আর্কটের নবাবের পুত্র হত্যা করায় তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহন করতে হয়। তিনি তার কন্যার সাথে পালিয়ে যান এবং ৮ বছর আত্মগোপন করে থাকেন। সেই সময় তিনি একটি সেনাদল গঠন করেন এবং হায়দার আলির সঙ্গে জোটবদ্ধ হন। ১৭৮০ সালে তিনি সফলভাবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেন।



তার একজন বিশ্বস্ত অনুগামী 'কুইলি' নিজের সারা শরীরে ঘী ও তেল মাখিয়ে গায়ে আগুন ধরিয়ে, বারুদের মজুতখানায় ঢুকে যান। নাচিয়ার একজন বিশ্বস্ত শাসক ছিলেন। ২৫ ডিসেম্বর ১৭৯৬ সালে নাচিয়ার মারা যান।

☑ ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ

১৯ নভেম্বর, ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে কাশীতে (বারানসী) জন্ম গ্রহন করেন রানি মণিকর্ণিকা তাম্বে বা লক্ষী বাঈ। ১৮৪২ সালে ঝাঁসির মহারাজ গঙ্গাধর রাও নিওয়ালকরের সাথে বিবাহ হয়। তাঁরা এক পুত্র দত্তক নেন, নাম আনন্দ রাও। ঝাঁসীর মহারাজা গঙ্গাধর রাও ২১ নভেম্বর ১৮৫৩ সালে মৃত্যু বরন করেন। ডালহৌসী জানান যে ঝাঁসির সিংহাসনে প্রকৃত উত্তরাধিকারী নেই এবং ঝাঁসীকে কোম্পানীর নিয়ন্ত্রনাধীনে নেওয়া হবে। মার্চ ১৮৫৪ সালে ঝাঁসির রানীর সাথে ৫০,০০০ টাকা ভাতা হিসেবে মঞ্জুর করা হয় এবং ঝাঁসির কেল্লা পরিত্যাগ করার জন্য হুকুম জারী হয়। ২৩ মার্চ ১৮৫৮ তারিখে ব্রিটিশ বাহিনী ঝাঁসি অবরোধ করে। লক্ষী বাঈ তার বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর সেনা বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। ১৭ জুন ১৮৫৮ সালে ফুলবাগ এলাকার কাছাকাছি কোটাহ-কি-সেরাইয়ে রাজকীয় বাহিনীর সাথে প্রবল উদ্যমে যুদ্ধ চালিয়ে শহীদ হন।

☑ বেগম হজরত মহল

বেগম হজরত মহল (জন্ম আনুমানিক ১৮২০) ছিলেন আওধের বেগম এবং ওয়াজেদ আলি শাহ কলকাতায় নির্বাসিত হওয়ার পর তিনি আওধের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি পরাজিত হন। তিনি নেপালে আশ্রয় নেন। ৭ এপ্রিল ১৮৭৯ সালে কাঠমান্ডুতে তার মৃত্যু হয়।

## প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ওরফে রানী বা ছদ্মনামে ফুলতারা ছিলেন বাংলার ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম মুক্তিযোদ্ধা ও প্রথম বিপ্লবী মহিলা শহিদ। ১৯১১ সালের ৫ই মে মঙ্গলবার চট্টগ্রামের ধলঘাট গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। চট্টগ্রামের সংগ্রামী কার্যকলাপে মাস্টারদার নেতৃত্বে প্রধান সহযোগী রূপে তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। ১৯৩২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর মাস্টারদার নেতৃত্বে 'ইউরোপীয় ক্লাব' আক্রমন করেন ও ব্রিটিশ বাহিনীর সাথে গুলি বিনিময়ে আহত হন। পূর্ব নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে ধরা পড়ার চেয়ে পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করা শ্রেয় বলে মনে করেন ও শহীদ হয়ে যান।

## কল্পনা দত্ত

বীর কন্যা কল্পনা দত্ত ১৯১৩ সালের ২৭ জুলাই চট্টগ্রামের বোয়ালখালী থানার খরনদ্বীপ ইউনিয়নের শ্রীপুর গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। চট্টগ্রাম সংগ্রামের অন্যতম বিপ্লবীকন্যা কল্পনা, শহীদ ক্ষুদিরাম বসু ও বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বেথুন কলেজে গড়ে ওঠা 'ছাত্রী সংঘে' যোগদান করেন। ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমনের পরিকল্পনাকে সফল করার উদ্দেশ্যে আগাম সমীক্ষা করতে গিয়ে ধরা পরেন। জামিনে মুক্ত হয়ে পরবর্তী কালে আবার গ্রেফতার হন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারে যাবজ্জীবন জেল হয়। ১৯৯৫ সালে ৮ ফেব্রুয়ারি দিল্লীতে মৃত্যু হয়।

☐ সরোজিনী নাইডু

১৮৭৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ভারতের হায়দ্রাবাদে তাঁর জন্ম। সরোজিনী নাইডু ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। ১৯২৫ সালে তিনি অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসে যোগ দেন। তিনি সমগ্র ভারতে সভা সমাবেশ করে নারী মুক্তি, শ্রমিক অধিকার রক্ষা ও জাতীয়তাবাদের সমর্থনে তাঁর বার্তা প্রচার করেন। তিনি ১৯১৫ সালে বিহারে নীল চাষীদের অধিকারের দাবিতে প্রচারাভিযানে অংশ নেন। ১৯১৭ সালে নারীর ভোটাধিকারের দাবিতে অ্যানি বেসান্তকে সভাপতি করে উইমেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হলে নাইডু এই সংগঠনের সদস্য হন। ১৯১৯ সালে সরোজিনী নাইডু অল ইন্ডিয়া হোমরুল ডেপুটেশনের সদস্য হিসেবে ইংল্যান্ডে গমন করেন এবং ১৯২০ সালের জুলাই মাসে ভারতে ফিরে আসেন। ২রা মার্চ ১৯৪৯ তাঁর মৃত্যু হয়।

Raghunath Ray
HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT. GEN. DEG. COLLEGE, TEHATTA
TEHATTA, NADIA- 741160

☐ অ্যানি বেসান্ত

১ লা অক্টোবর ১৮৪৭ সালে ক্ল্যাপহ্যাম, লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। নিজে ভারতীয় না হয়েও সারাজীবন ভারতের স্বশাসনের জন্য আন্দোলন করে যাওয়ার নজির সম্ভবত আর কারও নেই। ১৯০২ ভারতে এসে সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ এবং সিন্ধ জাতীয় কলেজিয়েট বোর্ডের স্থাপন করেন তিনি। ১৯১৪, সারা বিশ্ব যখন প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে জর্জরিত, তিনি সর্বভারতীয় হোমরুল লীগ। জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়ে অ্যানি বেসান্ত এক বছর কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদও সামলেছিলেন। ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ সালে মাদ্রাজের আদিয়ারে শেষ নিঃশ্বাস নেন।

# TEHATTA GOVERNMENT COLLEGE

TEHATTA * NADIA

# UNIVERSITY OF KALYANI

**BA HONS 5th SEMESTER EXAMINATION - 2021-2022**

B.A HONS
SUB – HISTORY
PAPER – DSC-2

# NAME - SUBHAJIT DAS

ROLL - 3114157 NO - 2148414

Reg No - 036565

**SESSION : 2021-2022**

১) মেইজি জাপানের আধুনিকীকরণে কতটা পাশ্চিমী ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল?

⇒ জাপানি সম্রাট মেইজি ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কয়েক দশকের মধ্যে জাপান অতি দ্রুত এক আধুনিক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। এই সময় সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাপানে দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। এই পরিবর্তনকে বৈপ্লবিক বলা যায়। নব্য জাপানের কর্ণধাররা বুঝতে পেরেছিলেন যে, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে বা সমকক্ষতা অর্জন করতে হলে জাপানে দ্রুত আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা আছে। মেইজি রেস্টোরেশনের পর নবীন সম্রাট মেইজি ১৮৬৮ সালে এক 'Charter Oath' ঘোষণা করেছিলেন। তিনি জাপানের উন্নতির জন্য সমগ্রবিশ্ব থেকে জ্ঞান আহরণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছিলেন। এছাড়াও এই প্রতিজ্ঞাপত্রে পুরোনো ঐতিহ্যগুলোকে বিসর্জন দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। বহু ঐতিহাসিক জাপানি সম্রাটের এই ঘোষণাকে জাপানি জনগনের 'ম্যাগনাকার্টা' বা 'অধিকারের সনদ' বলে অভিহিত করেছেন।

নব্য জাপানের নায়কেরা উপলব্ধি করেছিলেন জাপানকে আধুনিক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে হলে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটাতে হবে। ১৮৭১ সালে সম্রাটের এক আদেশানুসারে জাপানে সামন্তপ্রথার অবসান হয়েছিল। একইসাথে জাপানের সমাজব্যবস্থায় যে চারটি শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল তারও বিলুপ্তি ঘটেছিল। সামন্ততন্ত্রের অবসানে দাইমো সামন্তপ্রভুদের কোনো ক্ষতি না হলেও সামুরাই শ্রেণী যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তারা ছিল যোদ্ধা শ্রেণী। কিন্তু মেইজি সরকারের গৃহীত সংস্কারের ফলে তারা বিপদে পড়ে। মেইজি সরকার সামুরাইদের অসন্তোষ দূর করার জন্য তাদের কাজকর্মে

ও শিল্পোদ্যোগে নিযুক্তির চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাতে জাপানে বিতর্ক শুরু হয়েছিল। ফলে সামুরাই শ্রেণীর অসন্তোষ আরো বৃদ্ধি পায়। এই অসন্তোষ বিদ্রোহের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। যদিও এই বিদ্রোহ সফল হয়নি। পরবর্তীকালে এই সামুরাই শ্রেণী জাপানি আমলাতন্ত্রের মেরুদণ্ড হিসাবে মেইজি প্রশাসনকে দক্ষ এবং শক্তিশালী করে তুলেছিল।

সামন্তপ্রথার অবসান জাপানি কৃষকদের জীবনের উপর প্রভাব ফেলেছিল। জমির ওপর কৃষকদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃতি পেয়েছিল। সামন্তপ্রথার অবসানের সাথে সাথে কৃষকদের ওপর থেকে বিভিন্ন ধরনের বিধিনিষেধ সরকার তুলে নিয়েছিল। মেইজি যুগে কৃষকদের উন্নতি হলেও তাদের জীবনে কোনো সমস্যা ছিল না তা বলা যাবেনা। তবে মেইজি সরকার কৃষকদের অসন্তোষকে দূর করার জন্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। অর্থকরী শস্যোৎপাদনের জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করা হয়েছিল। কৃষির উন্নতির সরকার কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটানো হয়েছিল। এইভাবে সামন্ততন্ত্রের অবসানের পর জাপান ক্রমশ একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল।

সামন্তপ্রথার অবসানের পর জাপানে সামরিক সংগঠনেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছিল। সরকার বিদেশী আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ সংকটকে প্রতিহত করার জন্য সামরিক শক্তির গুরুত্বকে বেশি অনুভব করেছিল। ইয়ামাগাতা আরিতোমো পুরোনো ঐতিহ্যকে পরিহার করে নতুন পদ্ধতিতে সামরিক সংগঠন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করেছিলেন এবং ইউরোপীয় পদ্ধতিতে জাপানি সামরিক সংগঠনকে গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন। সামুরাই শ্রেণী থেকে সেনা সংগ্রহের

পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয়েছিল। সরকার সারাদেশে বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে যোগদানের নীতি গ্রহণ করে। বাধ্যতামূলক সেনা সংগ্রহের পদক্ষেপকে যথার্থ করনে আধুনিক জাপান গঠনের পথে এক বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হয়।

সামন্ততন্ত্রের পতন জাপানে সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়েছিল। নব্য জাপানি নায়কেরা এটা উপলব্ধি করেছিল যে দেশকে আধুনিক ও শক্তিশালী করতে হলে সামাজিক সংস্কার করতে হবে। পাশ্চাত্যের সম কক্ষতা অর্জন করতে হলে পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করতে হবে। জাপানি সম্রাট নিজে উদারবাদী ছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক ও অনুরাগী ছিল। তিনি ইউরোপীয়ান সম্রাটদের আদবকায়দা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার উপকরণ দিয়ে জাপানকে সাজাতে চেয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের অনুকরণে পশ্চিমী ক্যালেন্ডার চালু হয়েছিল। এরফলে সাতদিনে সপ্তাহ ও রবিবার ছুটির দিন হিসাবে ধার্য হয়েছিল। পশ্চিমী সভ্যতার প্রভাব জাপানের নারী সমাজকেও প্রভাবিত করেছিল। ১৮৭২ সালে নারীরা প্রথম ধর্মস্থানে বা মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছিল। নারীশিক্ষার বিস্তারের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। মেয়েরাও পাশ্চাত্য পোশাক পরিধান করেছিল। এইভাবে মাত্র দু-দশকের মধ্যে জাপান পশ্চিমী ব্যবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিল।

মেইজি যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল। তারা পশ্চিমী ধাঁচে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার এনেছিলেন। বিদেশ থেকে পণ্ডিতদের জাপানে আনা হয়েছিল। বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Earnest Fenollosa জাপানে ১৮৭৮ সালে আসেন। তিনি জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। মেইজি শাসকেরা জাপানের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায়

আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন। জাপানে ত্রিস্তর শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। সেগুলি হল - প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়। মেইজি যুগে নারীশিক্ষাকে অবহেলা করা হয়নি। ১৮৮৫ সালে স্ত্রী শিক্ষার জন্য পৃথক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এইভাবে শিক্ষা সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জাপান হয়ে উঠেছিল এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষিত দেশ।

মেইজি রেস্টোরেশন জাপানের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক জীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিল। পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিকে সামনে রেখে নব্য জাপানিরা জাপানের সংস্কৃতিতে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিল। মেইজি যুগের সাহিত্য ইউরোপীয় সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ইউরোপীয় সাহিত্যিকরা জাপানের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল। মেইজি যুগ জাপানের সংগীত চর্চার ওপরও প্রভাব এনেছিল। জাপানের প্রচলিত গানকে পাশ্চাত্য সুরে পরিবেশন করা হয়েছিল। প্রাচ্যের শিল্পকলার অন্যতম মহান অভিব্যক্তি জাপানের চিত্রকলা। মেইজি যুগে জাপানের চিত্রকলা ইউরোপের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ইতালির শিল্প দ্বারা জাপান অনুপ্রাণিত হয়েছিল। মেইজি যুগে জাপানি শিল্পীরা পাশ্চাত্য রীতিতে তেলরঙের ছবি আঁকা শুরু করেছিলেন কিন্তু তেলরঙ জাপানে সমাদৃত হয়নি। ১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'নিপ্পোন-বিজুৎসু-ইন' নামে এক জাতীয় শিল্প সাধনার প্রতিষ্ঠান। শিল্পীরা পাশ্চাত্য রীতি ও আঙ্গিকের সঙ্গে ঐতিহ্যগত জাপানের শিল্পরীতির সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। জাপানি সংস্কৃতির অঙ্গ হল নাটক। পাশ্চাত্য ভাবধারাকে জাপানি নাটকে স্থান দেওয়া হয়েছিল।

সকলেই এই ধার করা সংস্কৃতিকে মেনে নিয়েছিল তা বলা যাবে না। অনেকেই এর বিরোধিতা করেছিল। সংস্কারিত জাপানের সংস্কৃতি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সার্থক সমন্বয়ী হয়ে উঠেছিল।

মেইজি সরকার আর্থিক সংস্কারের মাধ্যমে জাপানকে এক শক্তিশালী শিল্পনির্ভর দেশে পরিণত করার উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। এ ব্যাপারে জাপানের অর্থমন্ত্রী মাৎসুকাটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে জাপানের 'অর্থনীতির জনক' বলা হয়ে থাকে। জাপানের শিল্পায়নে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের মিলিত প্রচেষ্টা ছিল। জাপান অতি দ্রুতগতিতে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়েছিল। শিল্পায়নের পিছনে অন্যতম আর এক শর্ত হল যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন। মেইজি সরকার উপলব্ধি করেছিল পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন না হলে শিল্পায়ন সম্ভব নয়। তাই রেলপথের ওপর সরকার গুরুত্ব দিয়েছিল। জাপানি সরকারি সামরিক খাতেও ব্যয় বাড়িয়েছিল।

মেইজি সরকার খনি শিল্প বিকাশের দিকে গুরুত্ব দিয়েছিল। সরকার দেশের সমস্ত খনিজ সম্পদকে যেমন সোনা, রূপা, তামা, লোহা, কয়লাকে জাতীয় সম্পদ হিসাবে ঘোষণা করেছিল। খনিজ সম্পদের উত্তোলনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রেও মেইজি সরকার বিদেশী প্রযুক্তিবিদদের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করেছিল। এছাড়া জাপানের অন্যতম বড়ো শিল্পোদ্যোগ ছিল বস্ত্রশিল্প। বস্ত্র-শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব ছিল না। তুলো ও কাঁচা রেশম প্রচুর পরিমানে উৎপাদিত হত। বস্ত্রশিল্পের উপযোগী প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিদদের বিদেশ থেকে আনা হয়েছিল। মেইজি যুগে মাঝারি ও ছোটো শিল্পেরও বিকাশ হয়েছিল। জাপানের নব্য নায়কেরা এটা অনুভব করেছিলেন যে— পাশ্চাত্যের সমকক্ষতা অর্জন করতে হলে তাদের অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটাতে হবে। জাপানে শিল্পের বিকাশ তার বানিজ্যের বিকাশকে সমৃদ্ধ করেছিল। মুদ্রার ক্ষেত্রেও সংস্কার হয়েছিল। ১৮৭৩ সালে National Bank স্থাপন করা হয়েছিল। ১৮৮১ সরকারের নিয়ন্ত্রনে Bank of Japan প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পরিশেষে বলা যায়, মেইজি যুগে জাপানে সার্বিকভাবে যে পরিবর্তন এসেছিল তাকে সঠিক অর্থে 'বিপ্লব' বলা যায়। কিন্তু উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যেসব বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল জাপানের পরিবর্তনের প্রকৃতি ছিল তার থেকে অনেকটাই পৃথক। জাপানের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রতীক হিসেবে তারা সম্রাটকে সর্বশক্তির কেন্দ্রবিন্দু বলে ঘোষণা করেছিল। এর ফলে জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছিল। এই পরিবর্তনকে জাপানি সম্রাট স্বয়ং 'Enlightened rule' আখ্যা দিয়েছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে জাপান ইউরোপের আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করেছিল। ফলস্বরূপ জাপান অতি দ্রুত একটি শক্তিশালী আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। জাপানের পরিবর্তন সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের দূর প্রাচ্যের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছিল বিশেষভাবে। এ প্রসঙ্গে আমরা চীনের কথা বলতে পারি। চীন পাশ্চাত্য ভাবধারাকে গ্রহণ করতে চায়নি কিন্তু জাপান পাশ্চাত্য শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিল এবং তার ফলে জাপান দ্রুতগতিতে নিজেকে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছিল। ১৮৯৪-৯৫ সালে চীন জাপান যুদ্ধ শুরু হলে জাপান বিশালে চীনকে পরাজিত করেছিল। শুধু চীনকে পরাজিত করেই জাপান থামেনি। ১৯০২ সালে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি ইংল্যান্ডের সঙ্গে চুক্তি কিম্বা ১৯০৪-০৫ সালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে তার সাফল্য প্রমাণ করেছিল জাপান বিশ্ব রাজনীতিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে।

Raghunath Roy
HEAD
DEPARTMENT OF HISTORY
GOVT. GEN. DEG. COLLEGE, TEHATTA
TEHATTA, NADIA- 741160